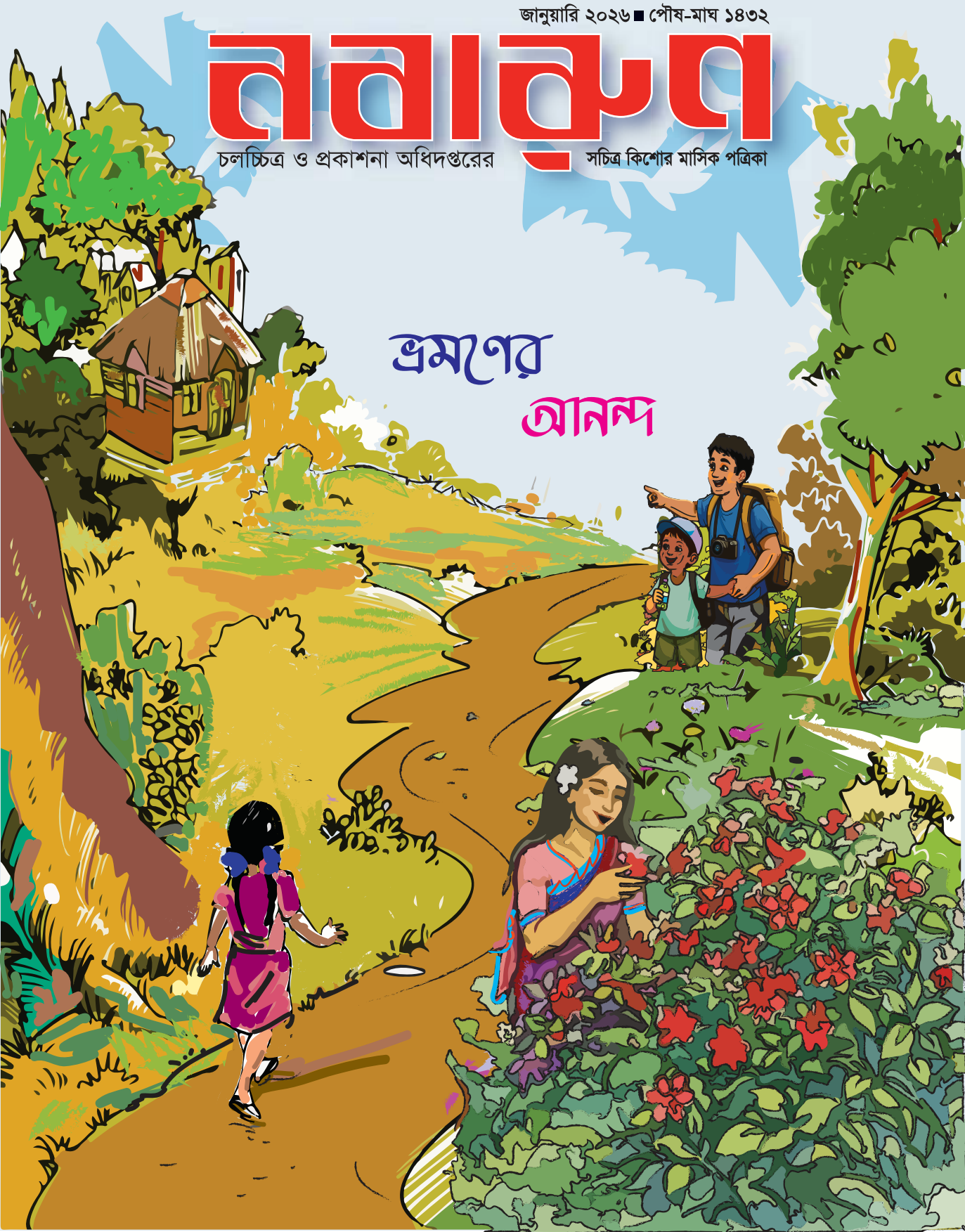
জানুয়ারি ২০২৬ ■ পৌষ-মাঘ ১৪৩২

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা





নীলাদ্রি শেখর সমদ্দার (ঋদ্ধ), পঞ্চম শ্রেণি, বাংলাদেশ ইন্টান্যাশনাল টিউটোরিয়াল, ঢাকা



মো. ফারহান হুসাইন আলিফ, চতুর্থ শ্রেণি, রোজ গার্ডেন হাই স্কুল ঢাকা।

সম্পাদকীয়

‘গ্রামছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ, আমার মন ভোলায় রে’... এ গানের সাথে সাথে দৃশ্যপটে রাঙ্গামাটির পথ আমাদের অনেকের মনেই ভেসে উঠে বার বার। হাতছানি দেয় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ার। কখনো পাহাড়, কখনো সমুদ্র, নীলাকাশ, নির্জনতা এবং প্রকৃতি প্রতিদিনের নানা ব্যস্ততায় আমাদের অবসর দেয়। মনকে সতেজ রাখে, প্রশান্ত করে, আনন্দ দেয় আর নতুন উদ্যমে কাজ করার প্রেরণা জোগায়।

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা কি সমুদ্রসৈকতে কখনো ঝিনুক কুড়িয়েছ? পাহাড়ি ঝরনার কলকল শব্দ ও পাখির গান শুনেছ? মেঘের লুকোচুরি, দূর পাহাড়ে সূর্য ওঠা অথবা দিগন্তে অস্ত যাওয়া দেখেছ? প্রকৃতির মাঝে সময় কাটাতে তোমাদের ভ্রমণের আহ্বান জানাই। ভ্রমণ আনন্দ দেয়ার পাশাপাশি তোমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারকেও সমৃদ্ধ করবে। এসো বেরিয়ে পড়ি আমাদের নবারুণের ভ্রমণ সংখ্যা সাথে নিয়ে। পরীক্ষা শেষে বাবা-মাকে নিয়ে বেড়িয়ে এসো নতুন কোনো জায়গায়। প্রকৃতি তোমাদের ডাকছে, শুনতে কি পাও?

ভালো থেকো, নবারুণের সাথেই থেকো।

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
☎ ০২-৮৩০০৬৮৮
editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী
সহকারী পরিচালক
☎ ০২-৮৩০০৭০২

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
শাহিদা সুলতানা

সম্পাদক
চৌধুরী সাহেলা পারভীন

সিনিয়র সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহসম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

সূচি

নিবন্ধ

০৪ ভ্রমণের আনন্দ/ শাহীন সুলতানা
১০ ভ্রমণ বিষয়ক বই
১১ হাতছানি দেয় ঝরনা ও পাহাড়/ অপু বড়ুয়া
১৬ মেঘের বাড়ির রূপকথা/ মানসী খাতুন
১৮ দেশের সীমান্ত পর্যটন/ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ মজুমদার
২২ নওগাঁ জেলার দর্শনীয় স্থান/ শামস্ নূর
২৬ খুলনা ভ্রমণের হাতছানি/ তাজিম মাহমুদ
৩০ ভ্রমণের টুকিটাকি/ মেজবাউল হক
৩৩ সেন্টমার্টিন দ্বীপ/ এস এম মাসুদ
৩৫ ষাটগম্বুজ মসজিদের খলিফাতাবাদ
মুন্সী মো. নজরুল ইসলাম
৩৯ ঘুরে আসি পল্লিকবির গাঁয়ে/ তামান্না ইয়াসমিন বৃষ্টি
৪২ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কুমিল্লা
মো. তোফাজ্জল হোসেন তালুকদার
৪৪ দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ/ চন্দনকৃষ্ণ পাল
৪৬ চলো যাই সিলেটে/ সাফায়েত কবীর
৪৯ স্মৃতির পাতায় সিলেট/ মাহমুদা দিনা
৫১ একদিনের ভ্রমণ/ আশিকুর রহমান চৌধুরী
৫৪ ঢাকার কিছু দর্শনীয় স্থান/ মাহমুদা কামাল
৫৭ আইল্যান্ড হপিং/ ডালিয়া ইয়াসমিন
৬০ বিশ্ববিখ্যাত পরিব্রাজক/ রাহাত আরা চৌধুরী
৬৩ পাহাড়ের বুকে মৌচাক / ফারজানা হক

গল্প

০৬ রঙিন রেলগাড়িতে রহস্যময় ভ্রমণ
মোহাম্মদ আবুল হোসেন
২০ ইজানের পাহাড়পুর ভ্রমণ/ মুসতাফা আনসারী
৩১ রিমি আর মালার সমুদ্র ভ্রমণ/ শাম্মী তুলতুল

কবিতাগুচ্ছ

১৯ গুলজার আহমেদ
২৫ মোহাম্মদ ফারুক আহমেদ
৩২ মোশারফ হোসেন
৩৪ মো. মাহমুদুল কবীর (শামীম)
৪১ আহসানুল হক
৪৫ বদরুল হক
৫০ গাজী আবদুস সালাম
৫৩ টিটু মালাকার

ছোটোদের ছড়া

১৭ মো. পিয়াস আহমেদ
২৯ মোহাম্মদ আদনান আহমেদ
৪৮ মোহাম্মদ রনি আহমেদ

ছোটোদের লেখা

৫৬ পাহাড়ের দেশে/ নাফিসা তাসনিম স্নেহা

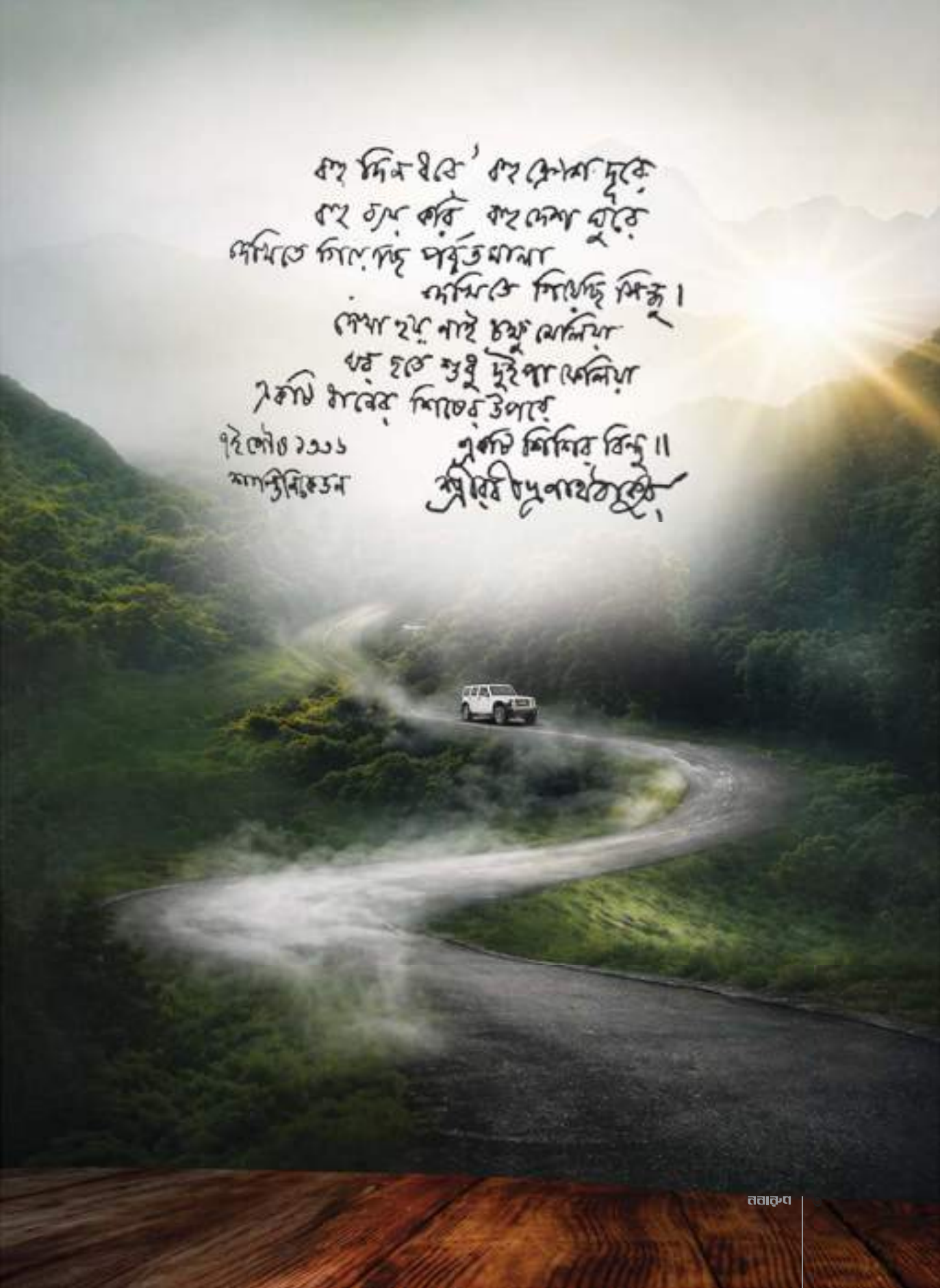
আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : নীলাদ্রি শেখর সমদ্দার (ঋদ্ধ)
মো. ফারহান হুসাইন আলিফ
তৃতীয় প্রচ্ছদ : তামাজুর জামান গল্প/ আরিবা তাবাসসুম
শেষ প্রচ্ছদ : আনিসা চৌধুরী
৪১ নাইমুল ইসলাম

নবারুণ পত্রিকা পড়া ও ডাউনলোড করা যাবে

Nobarun Potrika

www.dfp.gov.bd

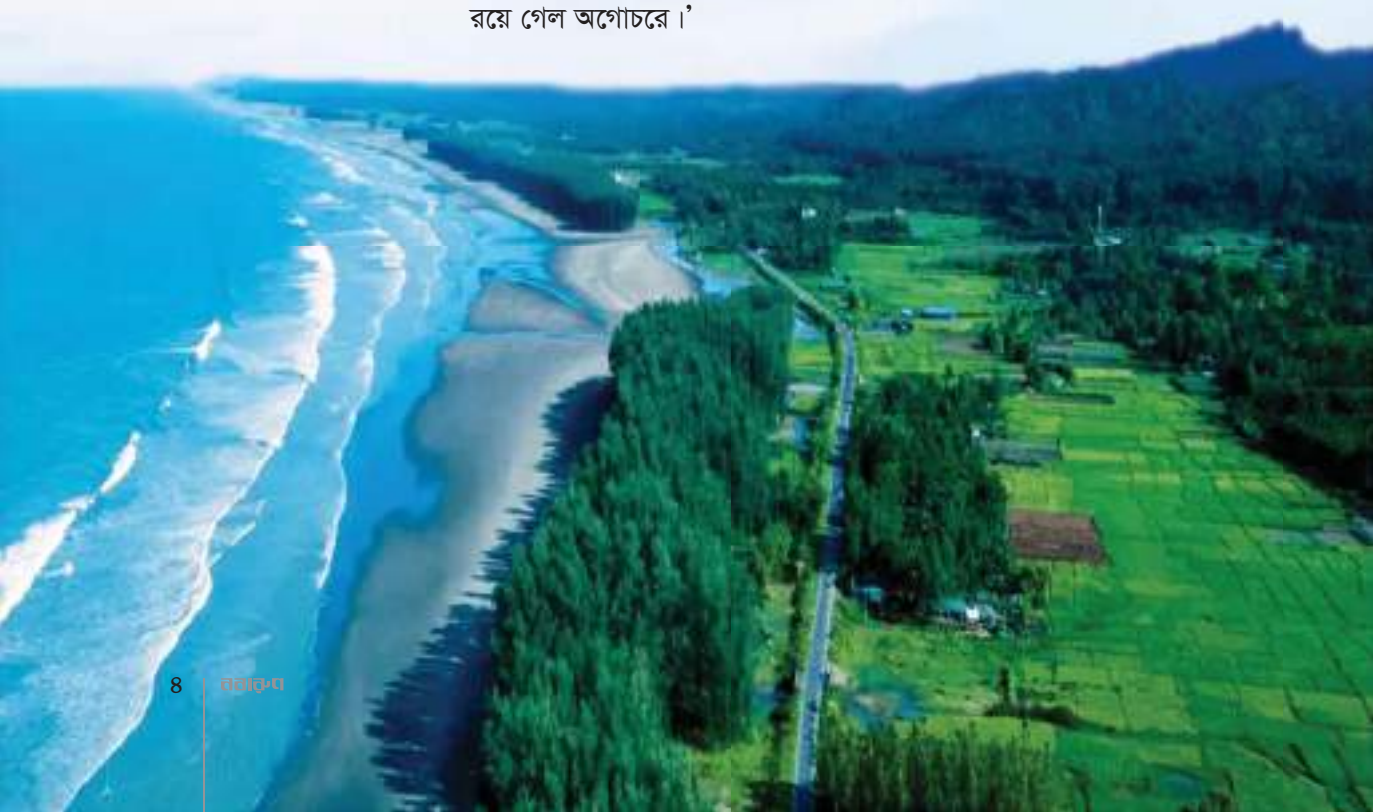

বহু দিন ধরে' বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুইপা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু ॥
শান্তিনিকেতন
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভ্রমণের আনন্দ

শাহীন সুলতানা

ভ্রমণ মানে আনন্দ। ভ্রমণ মানে জীবনের এক অনন্য অভিজ্ঞতা। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাপনে যখন একঘেয়েমি ভর করে তখন ভ্রমণ হয়ে ওঠে একমাত্র নিরাময়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন-

'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব কত অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।'



সত্যি তাই! বই পড়ে আমরা জ্ঞান অর্জন করি ঠিকই তবে ভ্রমণ আমাদের সেই অর্জিত জ্ঞানকে জীবন্ত করে তোলে। মানুষের জীবনে নানা অভিজ্ঞতা এবং নির্ভেজাল আনন্দ উপভোগের জন্য ভ্রমণের কোনো বিকল্প নেই। ভ্রমণ মানেই আনন্দপাঠ। প্রাত্যহিক যান্ত্রিক জীবন থেকে মন ও শরীরকে বিশ্রাম দেওয়ার এক অভিনব পদ্ধতি হতে পারে ভ্রমণ।

আমরা প্রতিনিয়ত একই পরিবেশে বসবাস করি। একই পরিবার, একই স্কুল, একই রাস্তাঘাট, একই ঘর-দুয়ার-আঙিনা, একই পরিসরে থাকতে থাকতে এক সময় হাঁপিয়ে উঠি। বিশেষ করে যারা তরুণ বা কিশোর তাদের এই একঘেয়েমি দেহ-মনে ক্লান্তি এনে দেয়। এই ক্লান্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সহজ সমাধান হচ্ছে ভ্রমণ। কেননা ভ্রমণে গেলে অবসাদ বা ক্লান্তি দূর হয়ে মন-প্রাণ সতেজ হয়ে ওঠে।

ফলে কাজের গতি পাওয়া যায়। মানসিক প্রশান্তি আসে। এখানে দৈনন্দিন রুটিন নেই, পরীক্ষার সিলেবাস নেই, মায়ের বকুনি নেই... এ যেন আনন্দের মাধ্যমে নীরব শিক্ষা লাভ আর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। তাই মন এবং শরীরকে চাঙা বা ফুরফুরে রাখতে ভ্রমণের কোনো বিকল্প নেই।

এই ভ্রমণ বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন- বাস ভ্রমণ, ট্রেন ভ্রমণ, নৌকাভ্রমণ কিংবা দেশ বা বিদেশ ভ্রমণ। আবার দূরে না গেলে যে ভ্রমণ বলা যাবে না সেটা কিন্তু নয়। খুব কাছের কোনো স্থানকেও আমরা ভ্রমণের জন্য বেছে নিতে পারি। চোখ জুড়ানো ফসলের ক্ষেত, খোলা মাঠ, সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি, জেলেদের জীবন প্রণালী, বালিহাঁস ও সাদা বকের ঝাঁক দেখা, ধানের ক্ষেতে শালিকের বিচরণ, নদীর ঘাটে ছেলে-মেয়েদের সাঁতার কাটার দৃশ্যও হতে পারে ভ্রমণের ক্ষেত্র।

সবুজ অরণ্য, সুউচ্চ পাহাড়, সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি, সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের শোভা- এ যেন এক নতুন পৃথিবীর ছবি মনে করিয়ে দেয়। এমন ভ্রমণে শিক্ষা আর অভিজ্ঞতার ঝুলি দুটোই পরিপূর্ণ হয় বৈকি।

আনন্দের সাথে সাথে চারপাশের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা অর্জন হতে পারে ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য।

এছাড়া বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবন আচরণ, শিল্পকলা, বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলোও হতে পারে নির্মল আনন্দের খোরাক। এর মাধ্যমে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন হয়। অন্যের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়। চিন্তার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।

জীবনের যান্ত্রিকতা জীবনকে স্থবির করে। কিন্তু ভ্রমণ? সে তো জীবনকে নতুন করে আবার সাজিয়ে দেয়। স্বপ্ন দেখায়। বেঁচে ওঠার প্রেরণা দেয়। ইট-পাথরের জীবনকে রং আর রূপের জৌলুসে ভরিয়ে দেয়। জীবনকে নতুন করে আবিষ্কার করতে শেখায়। মানসিক প্রশান্তিতে ভরে দেয় কর্মব্যস্ত জীবন।

তবে একটু দূরে ভ্রমণে যাওয়ার আগে কিছু বিষয় মাথায় থাকলে ভ্রমণ আরও ফলপ্রসূ ও আনন্দদায়ক হতে পারে। যেমন দু'চারটি মজার বইপুস্তক, কাগজ-কলম, প্রয়োজনীয় টাকা, নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র, ওষুধ এবং শুকনো খাবারদাবারের বিষয়গুলো নিশ্চিত থাকলে পিছুটান কম থাকে।

তাই বলা যায়, ভ্রমণ মানে শুধু স্থান পরিবর্তন নয়, বরং নিজেকে আবিষ্কার করার এক অনন্য মাধ্যম। ব্যস্ত জীবনের ফাঁকে কীভাবে নিজেদের ছোটো ছোটো মুহূর্তগুলোকে আলো আর আনন্দে ভরিয়ে দেওয়া যায় ভ্রমণ শেখায় তার সমস্ত কলাকৌশল। পৃথিবী কতটা সুন্দর আর জীবন কতটা উপভোগ্য- তা কেবল ভ্রমণেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ❑

শিক্ষক, আড়পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফরিদপুর।

গল্প

রঙিন রেলগাড়িতে রহস্যময় ভ্রমণ

মোহাম্মদ আবুল হোসেন

রিমির তখন বয়স মাত্র আট বছর। তার সবচেয়ে প্রিয় কাজ মানচিত্র দেখা। পৃথিবীর মানচিত্র খুলে সে আঙুল দিয়ে কখনো পাহাড় ছোঁয়, কখনো নদী, আবার কখনো সমুদ্রের মাঝখানে ছোটো ছোটো দ্বীপে থেমে যায়। তারপর মাকে ডেকে বলে- মা, তুমি কি জানো এখানে মানচিত্রে যে অংশটা নীল দেখা যাচ্ছে সেটা পানি, আর সবুজটা মাঠ?

তার কথা শুনে মা তো অবাক। এত অল্প বয়সেই তার মেয়ে এত সুন্দর করে মানচিত্র পড়তে পারে!

রিমির বাবা একজন স্কুলশিক্ষক। আর মা ভ্রমণকাহিনি পড়তে ভীষণ ভালোবাসেন। মা তাকে কোনো ভ্রমণের গল্প না শোনালে রাতে রিমির ঘুমই আসে না। একদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে রিমি



দেখল তার টেবিলের ওপর একটা পুরনো খাম রাখা। খামটা হলদেটে, কোনাগুলো একটু ছেঁড়া। ওপরে লেখা-

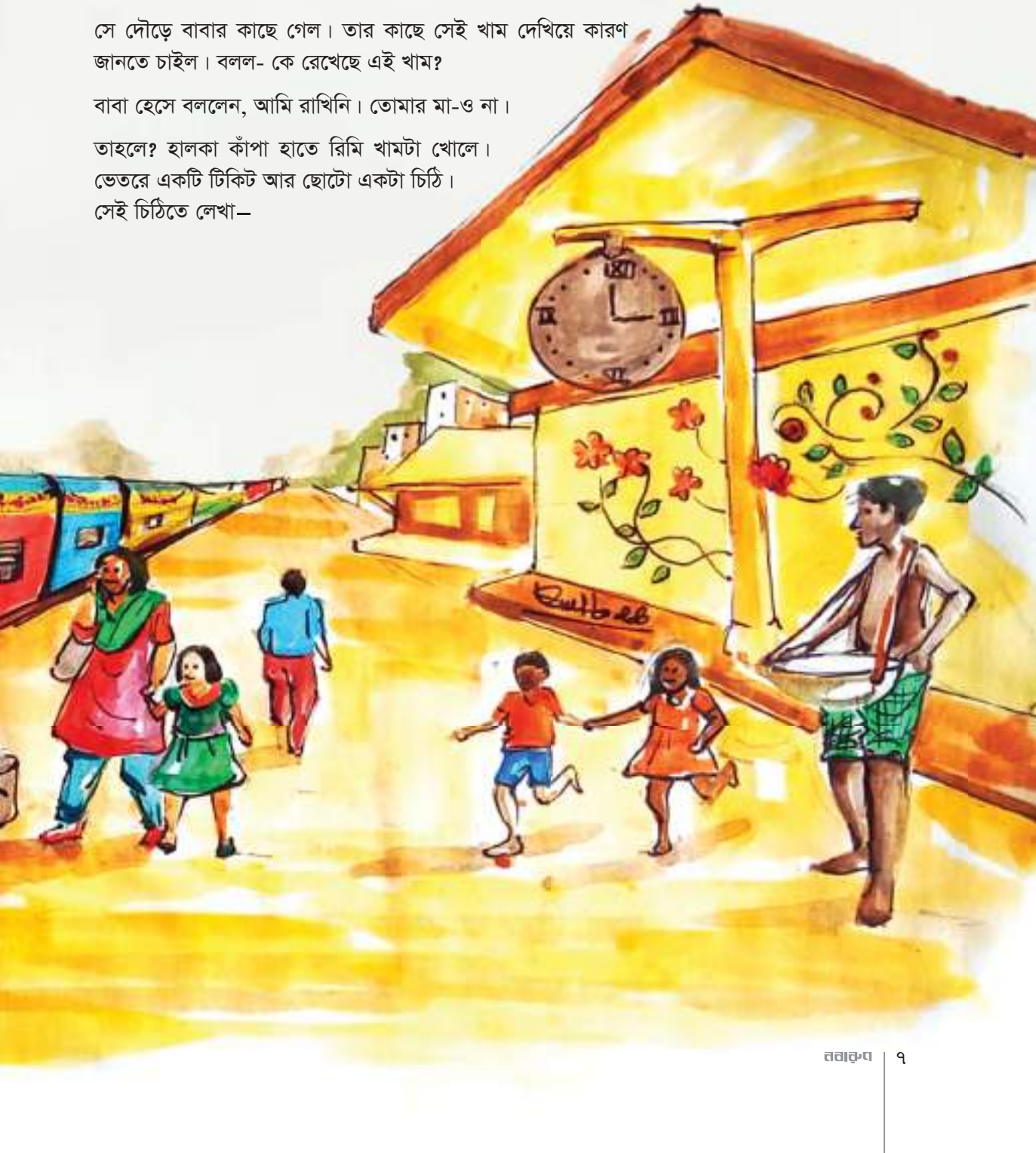
'যে শিশুরা ভ্রমণ ভালোবাসে, শুধু তারাই খুলবে এই খাম।'

তা দেখে রিমির চোখ বড়ো হয়ে গেল। সে ভাবতে লাগল- এটা কে রেখে গেল?

সে দৌড়ে বাবার কাছে গেল। তার কাছে সেই খাম দেখিয়ে কারণ জানতে চাইল। বলল- কে রেখেছে এই খাম?

বাবা হেসে বললেন, আমি রাখিনি। তোমার মা-ও না।

তাহলে? হালকা কাঁপা হাতে রিমি খামটা খোলে। ভেতরে একটি টিকিট আর ছোটো একটা চিঠি। সেই চিঠিতে লেখা—



‘আগামী শুক্রবার ঠিক সকাল সাতটায় পুরনো স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসো।

তোমার জন্য অপেক্ষা করবে রঙিন রেলগাড়ি।

ভ্রমণের সাহস থাকলে- এসো।’

রিমির বুক ধকধক করতে লাগল। এটা কি সত্যি? নাকি মজা?

বাবা-মা প্রথমে বিশ্বাসই করলেন না। তারা রিমিকে এই ভ্রমণে যেতে দিতে রাজি হলেন না। কিন্তু রিমি মন খারাপ করল। ভাবল- নিশ্চয়ই কোনো অ্যাডভেঞ্চার আছে এই ভ্রমণে। তাকে কেউ সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য এটা করেছে। সে মুখ ভার করে বসে রইল। তা দেখে শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন বাবা-মা।

মা বললেন- তাহলে আমরাও যাব।

পুরনো স্টেশনটা এমন সুন্দর করে সাজানো যেন গল্পের বই থেকে উঠে এসেছে। দেয়ালে লতাপাতা, ঘড়িটা কেমন ধীরে টিকটিক করছে। পাশে শিশুরা খেলা করছে। ফেরিওয়ালা বাদাম বিক্রি করছে। হঠাৎ শোনা গেল- ঢং ঢং ঢং!

তিন নম্বর প্লাটফর্মে ঢুকে পড়ল এক অদ্ভুত ট্রেন।

লাল, নীল, হলুদ, সবুজ- সব রঙে ভরা সেই ট্রেন। জানালার পাশে এঁকে রাখা হাসিমুখ। ইঞ্জিনের সামনে লেখা—

‘রঙিন রেলগাড়ি’।

ট্রেন থেকে নামলেন লম্বা টুপি পরা এক লোক।

তিনি হেসে বললেন- আমি কন্ডাক্টর টুনটুনি। তোমরা কি ভ্রমণ করতে চাও?

রিমি এক লাফে বলল, হ্যাঁ!

অমনি দরজা খুলে গেল। মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে রিমি লাফিয়ে উঠে পড়ল। ট্রেনের ভিতরে সিটের সামনে পপাই কার্টুন ঝুলছে। হঠাৎ হঠাৎ লাফিয়ে উঠছে সে। এ সিট থেকে লাফিয়ে ও সিটে যাচ্ছে। একটি মেয়ের মাথার ফিতা ধরে টান দিচ্ছে। মিকি মাউস উঁকি দিচ্ছে পাশের জানালা থেকে। ট্রেন চলতেই জানালার বাইরের দৃশ্য বদলাতে লাগল।

চলতে চলতে ট্রেন থামল একটা গ্রামে। তার চারদিকে ধানক্ষেত, গরু, নদী আর কাশফুল। একটা রাখাল গরুগুলোকে দেখাশোনা করছে। দুটি শিশু আঁচলে ছেঁকে হাঁটুপানিতে মাছ ধরছে। নদীতে গোসল করছে কৃষক। কৃষাণি উঠোনে ব্যস্ত। একটা ছেলে ট্রেন দেখে দৌড়ে এসে বলল আমি বাবু। সে জানতে চাইল— তোমরা কি শহর থেকে এসেছ?



রিমি মাথা নাড়ায়। বাবু তাদেরকে তাদের গ্রামে স্বাগত জানায়। তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে। মা-বাবাকে নিয়ে রিমি চলে যায় বাবুদের বাড়ি। বাবুর মা-বাবা খুব ভালো মানুষ। তাদের গৃহস্থ পরিবার। উঠোনে ধানের মলন চলছে। অনেকক্ষণ উঠোনে দাঁড়িয়ে তা দেখে রিমি। বাবু তাদের নিয়ে গেল নৌকা

ভ্রমণে। এবার রিমি প্রথমবার দেখল- পানিতে আকাশের ছবি, মাছ লাফাচ্ছে, পাল তোলা নৌকা যাচ্ছে, মাঝি গান গাইছে, দেখে রিমির মনটা ভরে গেল। তাকে বাবু বলল- গ্রাম মানে শুধু একটা জায়গা না। গ্রাম মানে গল্প। কবিদের কবিতার মতো সাজানো।

বাবুদের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে ওরা আবার ট্রেনে উঠে পড়ল। ট্রেন ছুটছে তো ছুটছে। ছোটো ছোটো পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে ট্রেন ছুটছে। এক সময় চারদিকে দেখা যায় শুধু পাহাড়। সেখানে হাত বাড়ালেই মেঘ ছোঁয়া যায়। ট্রেন দেখে এক পাহাড়ি মেয়ে এগিয়ে এল তাদের দিকে। তার পরিচয় দিল- আমার নাম লুমা। এই পাহাড়েই আমাদের বসতি। চলো তোমাদেরকে পাহাড় দেখাই।

লুমা তাদের শিখিয়ে দিল কীভাবে পাহাড়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে হয়, কীভাবে প্রকৃতির শব্দ শুনতে হয়, কেন পাহাড়কে ভালোবাসতে হয়। পাহাড়ের কান্নার শব্দ শুনতে হয় হৃদয় দিয়ে। বিমূর্ত মনে সেই কান্না বা গান শুনতে হয়। হঠাৎ বৃষ্টি নামল সেখানে। সবাই সেই পাহাড়ের পাথরের গুহায় আশ্রয় নিল। বৃষ্টির শব্দে রিমির মনে হলো যেন পাহাড় গান গাইছে।

সেখান থেকে তাদের ট্রেন আবার ছুটতে শুরু করল। এবার ট্রেন থামল এক সমুদ্রের পাশে। দূর থেকে ভেসে আসছে ঢেউয়ের শব্দ– শাঁ শাঁ শাঁ। এবারই প্রথম ট্রেনের ভিতর থেকে রিমি সমুদ্র দেখছে। সমুদ্রের নীল জলরাশি। সাদা ফেনা। মায়ের হাত ধরে রিমি গিয়ে পানির কাছে দাঁড়ায়। ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে ওর পায়ে। রিমির মনে হচ্ছে, সমুদ্র এসে ওর পা ধুইয়ে দিচ্ছে। দূরে সাম্পান নামের নৌকা ঢেউয়ের তালে তালে একবার উপরে ভেসে উঠছে আবার যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। এ দৃশ্য রিমির কাছে ভীষণ আনন্দের। সে সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে ভাসমান একটি সাম্পানের ছবি এঁকে ফেলে। তা দেখে এক বৃদ্ধ জেলে বললেন, সমুদ্র আমাদেরকে ধৈর্য ধরতে শেখায়।

রিমি বলল- হ্যাঁ, আমি অনেক ধৈর্যশীল হবো।

তারা বালিতে দুর্গ বানালো। রিমি একটা লাভ সাইন আঁকল। বাবা-মাকে বলল- এই লাভ সাইনটা তোমাদের জন্য।

তা শুনে বাবা তাকে জড়িয়ে ধরলেন। কপালে চুমু দিলেন। তারা একসঙ্গে ঝিনুক কুড়ালো, সূর্যাস্ত দেখল। তারপর আবার ট্রেনে উঠে পড়ল।

শেষ স্টেশনে ট্রেন থামতেই চারপাশ অন্ধকার। হঠাৎ আকাশে আলো জ্বলে উঠল। এটা স্বপ্নের শহর। এখানে বই উড়ে বেড়ায়, মানচিত্র কথা বলে, আর শিশুরা যা শেখে- তা সত্যি হয়ে যায়। হঠাৎ একটা বই উড়ে এল রিমির কাছে। বইটা হাত দিয়ে ধরতে হয় না, শুধু ইচ্ছে করলেই চোখের সামনে তা স্থির হয়ে যায়। একা একাই পৃষ্ঠা উলটাতে থাকে। তাতে প্রদর্শিত হয় লেখা। একই সঙ্গে আঁকা ছবিও। রিমি একটা বই পড়ল। তাতে লেখা- এই শহরের প্রতিটি শিশু এক একটা ফুল। তারা যখন রাস্তায় হাঁটে তখন গাড়ি থেমে যায় তাদেরকে দেখে। এই শহরের সবচেয়ে পবিত্র এই ফুল শিশুরা।

কন্ডাক্টর টুনটুনি বলল, ভ্রমণ মানে শুধু ঘোরা না, ভ্রমণ মানে শেখা, অনুভব করা, মানুষ হওয়া। তা শুনে রিমির চোখে জল এসে গেল।

এবার ফেরার পালা। হঠাৎ কে যেন ডাকতে থাকেন- ‘রিমি! রিমি!’

রিমি চোখ খুলে দেখে সে নিজের বিছানায় শুয়ে আছে। টেবিলে মানচিত্র, পাশে স্কুলব্যাগ।

তবে কি সব স্বপ্ন ছিল?

কিন্তু বালিশের পাশে পড়ে আছে রঙিন ট্রেনের একটা ছোটো টিকিট।

রিমি হাসল। সে জানে- ভ্রমণ শুরু হয়ে গেছে। পৃথিবী এখন তার সীমানা। ❑

অ্যাসিসট্যান্ট এডিটর, দৈনিক মানবজমিন

ভ্রমণ বিষয়ক বই


চাঁদের পাহাড়
ভ্রমণসমগ্র
হুমায়ূন আহমেদ
ভ্রমণ সাহিত্য
Jonathan Swift
GULLIVER'S TRAVELS
দেশে বিদেশে
পায়ের তলায় সর্ষে ১
ভ্রমণ সমগ্র
ঢল খুসাফির
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
ভ্রমণ সমগ্র
বিস্ময়ের বিশ্বপথে
হানিফ সংকেত



হাতছানি দেয় ঝরনা ও পাহাড়

অপু বড়ুয়া

বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? ভালো নিশ্চয়ই। সবার বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। স্কুলের ফলাফল প্রকাশ করার আগে মামার বাড়ি খালার বাড়ি বা অনেকে দূরে কোথাও বেড়ানোরও সিদ্ধান্ত নিয়েছ হয়ত। কক্সবাজার সাগর দেখতে গিয়েছ অনেকবার। তাই না। এবার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রূপের রানি পাহাড় বেষ্টিত খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙামাটি বেড়িয়ে যেতে পারো। এখানে এলে সবুজ গাছে গাছে বানরের লাফালাফি, পাখির চেঁচামেচি, দূরে কোথাও শেয়ালের ডাক শুনতে পাবে। সত্যি ভালো লাগবে তোমাদের। বেড়াতে এলে যেগুলো দেখবে–

আলুটিলা পর্যটন কেন্দ্র : আলুটিলা পর্যটন কেন্দ্রটি খাগড়াছড়ি জেলা শহার থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে পৌরসভার সীমান্তে মাটিরাঙ্গা উপজেলায় অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০ ফুট পাহাড়ের উপরে রহস্যময় গুহা এবং পাহাড়ি পরিবেশের অনাবিল সৌন্দর্য হাতছানি দেয় আলুটিলা পর্যটন কেন্দ্র। পাশাপাশি দুই পাহাড়ের সেতুবন্ধন ১৪৮ ফুট দৈর্ঘ্য ঝুলন্ত ব্রিজ ছোটো-বড়ো সবার মন কাড়ে। আকাশে মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখে মনে হয় হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ আলুটিলা প্রাকৃতিক গুহা। বিশাল পাহাড়ের নিচে গুহাটির দৈর্ঘ্য ৩৫০ ফুট। ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মশাল জ্বালিয়ে হাতে টর্চ নিয়ে গুহার ভেতরে যেতে পারো তোমরা। ভয়ের কিছু নেই, তবে অ্যাডভেঞ্চার বটে। মনে রাখবে সাথে মা-বাবা, বড়ো ভাই কিংবা বড়োজন না থাকলে গুহায় তোমাদের একা একা যাওয়া কখনো উচিত হবে না।



খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ হর্টিকালচার পার্ক: খাগড়াছড়ি সদরের পৌরসভার জিরো মাইল স্থানে আছে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ হর্টিকালচার পার্ক। ঝুলন্ত ব্রিজ দুই পাহাড়কে যুক্ত করেছে। এপাড়-ওপাড় যেতে পারবে হেলেদুলে, খুব ভালো লাগবে তোমাদের। পার্কের ভেতরে প্রশস্ত পাকা রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে বসতে ইচ্ছে হলে বসতে পারো।

দেবতার পুকুর : খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার নুনছড়ি মৌজায় দেবতার পুকুরটি অবস্থিত। সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় এই পুকুরে সবসময় পানি থাকে এমনকি গ্রীষ্মকালেও পানি শুকায় না বলে এই পুকুরকে নিয়ে রয়েছে নানা জল্পনাকল্পনা। কেউ জানে না কখন কীভাবে এই পুকুরের উৎপত্তি। অনেকে মনে করেন দেবতারা এক রাতেই এত বড়ো পুকুর খনন করেছেন। পাহাড়ের এত উঁচুতে এই পুকুরের পানি কখনো কেউ শুকাতে দেখেনি। সেই থেকে এই পুকুরের নাম হয় দেবতার পুকুর। পুকুরের পানিতে নামা কিংবা গোসল করা মোটেই নিরাপদ নয়।

রিছাং ঝরনা: খাগড়াছড়ির পর্যটকদের বাড়তি আকর্ষণ প্রকৃতির দান রিছাং ঝরনা। খাগড়াছড়ি শহর থেকে খাগড়াছড়ি শহড় থেকে প্রায় ১০/১১ কি.মি. দূরে এ ঝরনার বয়ে চলা, ঝরনায় পৌঁছার আগে পাহাড় থেকে নেমে পার হতে হবে ১৫০ ধাপের সিঁড়ি। তেব দেখ মিলবে ১২০ ফুট উচু পাহাড় থেকে গড়িয়ে পরা ঝরনার। আসতে-যেতে দুধারে পাহাড় নদী আর বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বৌদ্ধমন্দিরের দেখা মিলবে। বার্মিজ আরাকান ডিজাইনে তৈরিকৃত বিভিন্ন কারুকাজে নির্মিত মন্দিরগুলো খুবই সুন্দর।

সাজেক : সাজেক একটি নন্দিত পর্যটক স্পট। রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নে অবস্থিত। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো ইউয়িন, প্রায় ৭০২ বর্গমাইল। রাঙামাটির লেকবেষ্টিত সর্ব উত্তরে মিজোরাম সীমান্তে সাজেকের অবস্থান। সাজেকে রুইলুইপাড়া, হামারিপাড়া এবং কংলাকপাড়া নামে বিশাল উঁচু তিনটি পাহাড় আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ১৮৮৫ সালে



রিছাং ঝরনা



প্রতিষ্ঠিত রুইলুই পাহাড় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৭২০ ফুট এবং কংলাক পাহাড় ১৮০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। সাজেক রাঙামাটির ছাদ বলে পরিচিত। সাজেকে মূলত লুসাই, পাংখোয়া এবং ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের লোকের বাস। গাড়ি চলতে চলতে দু'পাশের দৃশ্য দেখে তোমরা মোহিত হয়ে যাবে। সাথে গান ধরবে – গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ...

রাঙামাটি

সুবলং ঝরনা : রাঙামাটি মানেই ৭২৫ বর্গ কিলোমিটারের বিশাল আকৃতির হ্রদ। আর সেখানেই আছে সুবলং ঝরনা। রাঙামাটি শহরের বোট ঘাট থেকে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগে ঝরনা পর্যটন কেন্দ্রে পৌঁছাতে। যাত্রা পথে বোটে চড়ে সবুজে আচ্ছাদিত বিশাল বিশাল পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে চলা কাপ্তাই হ্রদের নীল পানিতে জেলেদের ডিঙ্গি নিয়ে মাছ ধরার দৃশ্য দারুণ সুন্দর। আকাশে ভেসে বেড়ায় সাদা মেঘের ভেলা। ছোটো-বড়ো সব বয়সি পর্যটকদের বিমোহিত করে তোলে রাঙামাটির প্রাকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্য।

ঝুলন্ত সেতু : রাঙামাটি শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ঝুলন্ত সেতু। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের পর্যটন শিল্পের একটি আইকন। শুধু মাত্র দুটি পিলার আর ক্যাবলের মাধ্যমে এই সেতু দাঁড়িয়ে আছে বছরের পর বছর। সেতুতে হাঁটতে হাঁটতে দুলতে হয় বিধায় ছোটোরা খুব মজা উপভোগ করে। পর্যটকরা রাঙামাটি আসলেই ঝুলন্ত সেতুতে একবার দুলতে যাবে এটা নিশ্চিত।



পলওয়েল পার্ক : রাঙামাটি জেলা প্রশাসনের একান্ত প্রচেষ্টায় শহরের মধ্যে অবস্থিত নান্দনিক পর্যটন স্পট পলওয়েল পার্ক ছোটো-বড়ো সকলের মন কাড়বে। এখানে ঢুকতে টিকেটের প্রয়োজন হয়।

রাঙামাটি বন বিহার : অত্যন্ত নান্দনিক শিল্পকারুতে তৈরি সম্প্রদায়ের অন্যতম তীর্থস্থান রাঙামাটি বন বিহার। মন্দিরে ঢুকতে ও ঘুরে বেড়াতে কোনো টিকেট কিংবা অনুমতির প্রয়োজন হয় না। পবিত্রতা বজায় রাখতে হই-হুল্লোড় কিংবা জুতা-স্যান্ডেল নিয়ে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ। এ বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষু, শ্রামণেরা ধ্যানে মগ্ন থাকেন।

বান্দরবান

বান্দরবান পর্যটকদের জন্য খুবই প্রিয় কেননা সুউচ্চ পাহাড় যেন আকাশে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। পাহাড়ের দু'পাশে আঁকাবাঁকা রাস্তা দেখলে মনে হবে শিল্পীর আঁকা কোনো ছবি। বান্দরবানে আসলে বেড়ানো যাবে- নীলগিরি, নীলাচল, চিম্বুক পাহাড়, ডিম পাহাড়, বগালেক, নাফাখুম জলপ্রপাত, শৈলপ্রপাত, মেঘলা পর্যটন কমপ্লেক্স, স্বর্ণমন্দিরসহ আরো অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গায়।

মেঘলা পর্যটন কমপ্লেক্স : বান্দরবান শহরে প্রবেশ করতেই মাইল তিনেক আগে রাস্তার প্রবেশ মুখে বামে মেঘলা পর্যটন কমপ্লেক্স আর ডান পাশে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ। ভেতরে লেক, নৌকা, ঝুলন্ত ব্রিজ, লেক আর পাহাড়ের ফাঁকে হেঁটে হেঁটে বেড়াতে বেশ ভালো লাগে। বিভিন্ন পাখির কিচিরমিচির ডাক শোনা যায়। ঢুকতে গেইটে কাউন্টার থেকে টিকেট নিতে হবে।

স্বর্ণমন্দির : বান্দরবান শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে বালাঘাটায় রয়েছে স্বর্ণমন্দির বা স্বর্ণজাদি। পাহাড়ের চূড়ায় তৈরি এ সুদৃশ্য প্যাগোডায় সোনালী রঙের আধিক্যর জন্য স্বর্ণমন্দির হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশে এ ধরনের মন্দির আর নাই বললেই চলে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্যতম তীর্থভূমি স্বর্ণমন্দিরে যাওয়ার পথে বাম পাশে দেখা যাবে বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র বান্দরবান। বান্দরবান শহর থেকে মন্দিরের নিচে সড়কে যাওয়া





যায়। তারপর পায়ে হেঁটে কিংবা সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠে বুদ্ধ তথা মন্দির দর্শন করতে হয়। টিকেট নিয়ে পবিত্রতা রক্ষা করে জুতা, সেন্ডেল খুলে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। এই মন্দির আধুনিক ধর্মীয় স্থাপত্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

নীলাচলঃ বান্দরবান শহরের মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে নীলাচল পর্যটন কেন্দ্র। অসাধারণ দৃশ্য নীলাচলের। পর্যটকদের জন্য তৈরি করা হয়েছে বসার নান্দনিক অনেকগুলো স্থান, ছবি তোলার স্পট, বাহারি ফুলের বাগান। যেন উপজাতীয় সংস্কৃতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন। পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচের বাড়িঘর ও আঁকাবাঁকা রাস্তাগুলো দেখে মনে হবে যেন শিল্পীর তুলির আঁকা কোনো ছবি। সমুদ্রের পৃষ্ঠ থেকে নীলাচল ২৫০০ ফুট উচ্চতায় টাইগারপাড়া পাহাড়ে নীলাচল অবস্থিত। সকালে মেঘের ভেলার খেলা আর বিকালের সূর্যাস্তের দৃশ্যে নীলাচল তার পূর্ণ রূপ ধারণ করে। সব মিলিয়ে অসাধারণ সুন্দর একটি পর্যটন কেন্দ্র। বান্দরবান গেলে নীলাচল না গেলে বেড়ানোটা যেন অসম্পূর্ণ হবে তা নিশ্চিত করে বলা যায়।

নীলগিরিঃ নীলগিরি বাংলার দার্জিলিং হিসেবে পরিচিত। বান্দরবান শহর থেকে প্রায় ৫০ কি.মি. দূরে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত সবচেয়ে সুন্দর মনোরম স্থান। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ২২০০ ফুট উচ্চতায় মেঘ ছোঁয়ার ইচ্ছে হলে যেতে হবে নীলগিরি। বিকালের সূর্যাস্ত আর জ্যোৎস্না রাতের মায়াময় অপার সৌন্দর্য সহজে মুগ্ধ করে পর্যটকদের। যদি আকাশে মেঘ না থাকে নীলগিড়ি থেকে বাংলাদেশের ৫ম সর্বোচ্চ পাহাড় চূড়া কেওক্রাডাং,



কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত, সাঙ্গু নদী দেখা যায়। নীলগিরির কাছের আদিবাসী গ্রাম যেন শিল্পীর তুলির টানের শিল্পকারু। ❑

সহকারী প্রকৌশলী, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

মেঘের বাড়ির রূপকথা

মানসী খাতুন

ভ্রমণ মানে শুধু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন নয়; এটি একটি অভিজ্ঞতা। ভ্রমণ একটা জানালা- যা খুলে দেয় নতুন এক দিগন্ত। ভ্রমণ মানে হলো পাহাড়, নদী, সমুদ্র, বনের মতো অনেক কিছু দেখতে পাই। এতে মজা হয় এবং আমাদের অনেক কিছু শেখার সুযোগ হয়। ভ্রমণের সময় আমরা বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে আনন্দ করি, নতুন খাবার খাই আর নানান মানুষের জীবনধারা জানতে পারি। আমাদের মনকে বিকশিত করে, চিন্তাভাবনাকে বিস্তৃত করে। তাই শুধুই বেড়ানো নয়, এটি আনন্দ আর শিক্ষা মিশ্রিত এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। এমন এক আনন্দময় ভ্রমণের কথা আজ তোমাদের জানাবো।



সালটা ছিল ২০২৩। ক্যাম্পাস থেকে সহপাঠীদের সাথে মেঘে মোড়ানো পাহাড়ের দেশ সাজেক গিয়েছিলাম। চান্দের গাড়িতে করে উঁচুনীচু পাহাড়ি রাস্তা অতিক্রম করে আমরা সাজেক পৌঁছাই। পাহাড়ি রাস্তার দুই পাশের অপরূপ সৌন্দর্য সত্যিই দৃষ্টি কেড়ে নেবার মতো। পাহাড়ের গা ঘেঁষে যখন সূয্যি মামা যখন উঁকি দিচ্ছে তখনই আমরা পৌঁছে যাই সাজেকের রুইলুই পাড়ায়। পাহাড়ের সাথে মেঘের একাত্মতা, রংধনু, বিস্তৃত সবুজের সমারোহ বিমোহিত করেছে আমাদের। পাহাড়ের উপর থেকে নিচে তাকালে মনে হবে জনপদের মানুষগুলো বিন্দুর মতো। সেখানের স্থানীয় মানুষদের জীবনধারা সম্পর্কেও ধারণা পেয়েছি আমরা। আমাদের থাকার ঘরের পাশেই ছিল রুইলুই পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ওই স্কুলের দুজন ছোট্ট পাহাড়ি বাচ্চার সাথেও কথা হয়েছে আমার। তাদের দুইজনের নাম এখনো আমার স্মৃতিতে রয়ে গেছে। ওরা ত্রিপুরা ছিল। একজনের নাম অন্তর বাবু ত্রিপুরা, অন্যজন আচং ত্রিপুরা। বেশ ভালো সময় কেটেছে। সকালের নাশতা সেরে আমরা সাজেকের কংলাক পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হই। পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে সাদা সাদা মেঘের আলিঙ্গন আর দূর পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করেছি। মনে হয়েছে, আহ! যদি থেকে যেতে পারতাম আজীবন মেঘের বাড়ি পড়েছি। আর একটু হলেই আকাশ ছুঁতে পারব। প্রকৃতির নয়নাভিরাম রূপ আর পাহাড়ি এলাকার স্থানীয় খাবারের স্বাদ নেওয়ার সুযোগও হয়েছে। সন্ধ্যায় সাজেকের হেলিপ্যাড চত্বরে সময় কাটিয়েছি পাহাড়ের সন্ধ্যাবেলার দৃশ্য দেখে। পাহাড়ি এলাকায় তৈজসপত্র থেকে শুরু করে থাকার ঘর সবকিছুতে বাঁশের ছাপ রেখেছে পাহাড়িরা।

পাহাড় নিয়ে খুব সুন্দর একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। সবশেষে একরাশ স্মৃতি নিয়ে আমরা মেঘের ভেলায় ভাসতে ভাসতে আপন ঠিকানায় ফিরে এসেছি। ❑

শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সাজেকের মেঘ

মো. পিয়াস আহমেদ

আকাশ ফুঁড়ে জেগেছে যে পাহাড়,
মেঘের রাজ্যে মিলেমিশে একাকার।
পাহাড় ছুঁয়ে ভাসে মেঘের ভেলা,
ইচ্ছে করে মেঘের সাথে করি খেলা।

সূর্য উঠে মেঘের ফাঁকে,
আলো হাসে পাহাড় থেকে।
মেঘের রাজ্যে সন্ধ্যা তারা,
অপলক তাকিয়ে রয় পর্যটকরা।

সন্ধ্যা নামে নরম রঙে,
স্বপ্নেরা নাচে মেঘের ঢঙে।
তারার আলো নামে ধীরে,
মেঘেরা ভাসে পাহাড় ঘিরে।

সাজেক যেন আকাশের দেশ,
এখানে আনন্দের নেই শেষ।
ভ্রমণের সুখে ভরে প্রাণ,
পাহাড় ডাকে অবিরাম।

অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল



দেশের সীমান্ত পর্যটন

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ মজুমদার

বাংলাদেশের অন্যতম পার্বত্য জেলা বান্দরবানের পূর্ব প্রান্তে মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী দুর্গম পাহাড়ি এলাকার একটি দৃশ্য। এলাকাটি থানচি উপজেলার বঙ্কুপাড়া। গাড়ির জানালার একপাশ দিয়ে ঢুকে অন্যপাশ দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে মেঘ। সাপের মতো আকৃতির সড়ক বেয়ে গাড়ি উঠছে ওপরের দিকে, ৩ হাজার ফুটের বেশি উঁচুতে। যেখানে মেঘের শীতল পরশ বুলিয়ে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখা যায় মেঘ। চারপাশে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। যেগুলোর চূড়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা সাদা মেঘ। একবার সেখানে গেলে ফিরে আসতে বারণ করে মন।

সেখানে গাড়িতে যেতে থানচি উপজেলা শহর থেকে সময় লাগে প্রায় ৩ ঘণ্টা। যেখানে দেশের বড়ো বড়ো পাহাড়গুলো অবস্থিত। দুর্গম এই এলাকায় সড়কের এক পাশে মিয়ানমার, অন্য পাশে বাংলাদেশ। দেখতে প্রায় একই রকম। ভারতের মিজোরাম প্রদেশের পার্শ্ববর্তী রাঙামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলার সাইচল এলাকাও। রাঙামাটির রাজস্থলী উপজেলা সদর থেকে সীমান্ত সংযোগ সড়ক দিয়ে ফারুয়া হয়ে গাড়িযোগে এ এলাকায় পৌঁছাতে লাগবে প্রায় ৩ ঘণ্টা। যাওয়ার সময় পাহাড়ের চূড়ায় সবুজের বিন্দু ও উপত্যকায় ঠাসা সবুজ আবহ যে কারোরই মন কেড়ে নেবে।

সাইচল এলাকায় এক সময় কোনো সড়ক ছিল না। চিকিৎসা কিংবা কোনো কাজে জেলা শহর যেতে হলে পায়ে হেঁটে যেতে হতো সেখানকার বাসিন্দাদের। অসুস্থ হলে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হতো। এখন সড়ক নির্মাণ হওয়ায় মানুষের আসা-যাওয়া বেড়েছে। দুর্গম পাহাড়ে যারা বাস করতেন; তারা এখন সড়কের কাছাকাছি চলে এসেছেন।

এলাকাটি প্রাকৃতিকভাবেই পর্যটন কেন্দ্র হয়ে আছে। সেখানে নতুন করে অবকাঠামো তৈরি না করলেই প্রকৃতির জন্য আশীর্বাদ। শুধু পর্যটকদের নিরাপত্তা, বাসস্থান ও খাবারের ব্যবস্থা হলেই দেশ-বিদেশের পর্যটকেরা ছুটে যাবেন সেখানে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এ রকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলে আয় করছে বৈদেশিক মুদ্রা।

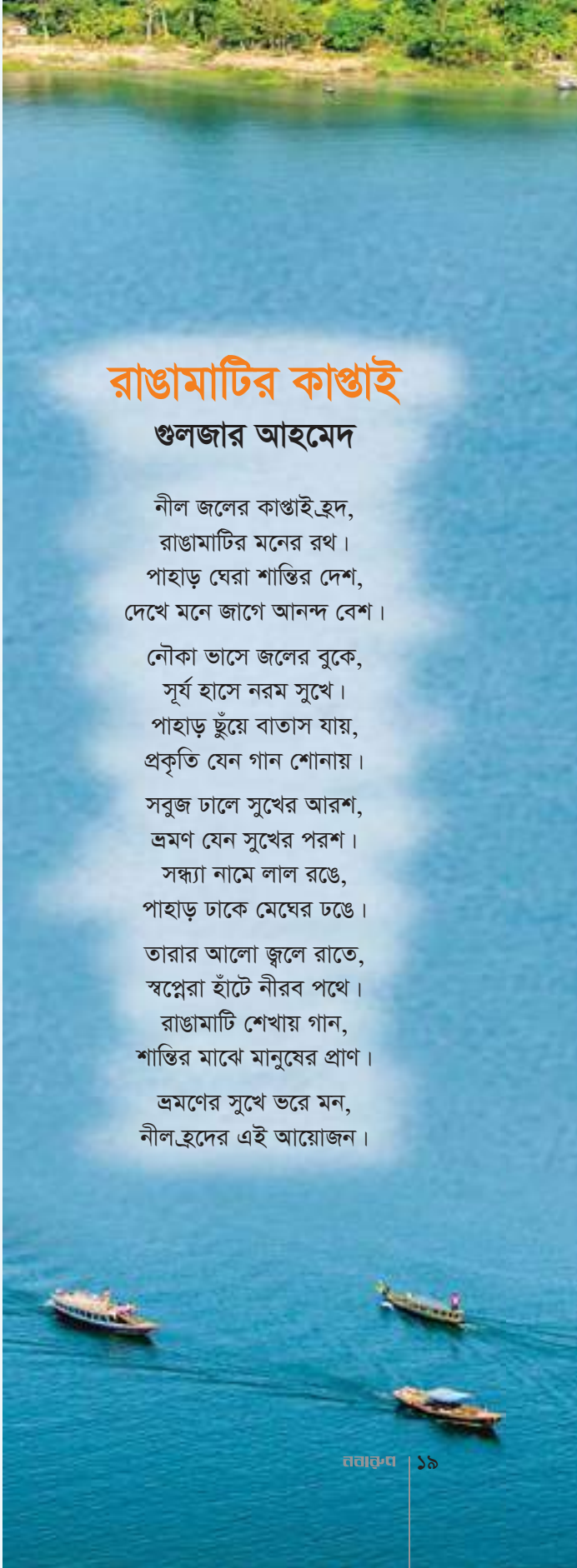
এক সময় সেখান থেকে রাঙামাটি সদরে আসা-যাওয়ায় প্রায় ৫-৬ দিন লাগত। এখন সীমান্ত সংযোগ সড়ক ব্যবহার করে কয়েক ঘণ্টায় আসা-যাওয়া করা যায়। এলাকার দৃশ্যগুলো ছবির মতো সুন্দর। সড়ক যেহেতু হয়ে গেছে, যথাযথ উদ্যোগ নিয়ে পর্যটন সুবিধা গড়ে তুললে সড়কটি শুধু যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকবে না, আন্তর্জাতিক পর্যটকের আনাগোনায় এটি বাংলাদেশের সক্ষমতা ও সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে উঠবে।

একজন পর্যটক ফেনী হয়ে রামগড়, তারপর সেখান থেকে শুরু করে ৩ পার্বত্য জেলার সীমান্তবর্তী সড়ক দিয়ে ঘুমধুম পৌঁছাবেন। সেখান থেকে মেরিন ড্রাইভ সড়ক দিয়ে কক্সবাজার পৌঁছাতে পারবেন অতি সহজেই। সীমান্ত পর্যটনের ধারণা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হলেও বাংলাদেশ বা আশপাশের জন্য খুবই নতুন। সীমান্ত পর্যটন বলতে বোঝায়, দুটি দেশের সীমানার কাছাকাছি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ঐতিহাসিক স্থানগুলো ঘুরে দেখা।

কক্সবাজারের নাফ নদী, পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল, কুমিল্লা ও ফেনীর বিভিন্ন স্থানের মতো স্থানগুলো বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় সীমান্ত পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে উঠে আসছে। যা নিরাপদ ও পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠলে আন্তর্জাতিক পর্যটনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। এটি শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ নয় বরং দুই দেশের মিলনস্থল বা সীমান্তের ভিন্ন জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিকে কাছ থেকে দেখারও সুযোগ করে দেওয়া যায় সীমান্ত পর্যটনের মাধ্যমে।

নদী, পাহাড়, চা-বাগান এবং ভিন্ন ভিন্ন ভূ-প্রকৃতির কারণে বাংলাদেশের সীমান্ত পর্যটন খুবই সমৃদ্ধ। সীমান্ত এলাকার স্থানীয় নৃ-গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও ঐতিহ্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে। নিরাপত্তা ও সীমান্তে মানুষের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে পরিকল্পিত পর্যটন স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙা করতে সহায়তা করে। ❑

সাংবাদিক, বাংলাভিশন



রাঙামাটির কাপ্তাই

গুলজার আহমেদ

নীল জলের কাপ্তাই হ্রদ,
রাঙামাটির মনের রথ।
পাহাড় ঘেরা শান্তির দেশ,
দেখে মনে জাগে আনন্দ বেশ।

নৌকা ভাসে জলের বুকে,
সূর্য হাসে নরম সুখে।
পাহাড় ছুঁয়ে বাতাস যায়,
প্রকৃতি যেন গান শোনায়।

সবুজ ঢালে সুখের আরশ,
ভ্রমণ যেন সুখের পরশ।
সন্ধ্যা নামে লাল রঙে,
পাহাড় ঢাকে মেঘের ঢঙে।

তারার আলো জ্বলে রাতে,
স্বপ্নেরা হাঁটে নীরব পথে।
রাঙামাটি শেখায় গান,
শান্তির মাঝে মানুষের প্রাণ।

ভ্রমণের সুখে ভরে মন,
নীল হ্রদের এই আয়োজন।



ইজানের পাহাড়পুর ভ্রমণ

মুসতাফা আনসারী

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ, স্কুল ছুটি। নানা বাড়ি বেড়াতে এসেছে ইজান। এসেই কোথায় কোথায় বেড়াতে যাবে তার একটি তালিকা ধরিয়ে দিয়েছে মামার হাতে। জয়পুরহাটের কাছাকাছি বেড়ানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থান সম্পর্কে আগেই তথ্য সংগ্রহ করেছে সে।

পাহাড়পুরের সোমপুর বৌদ্ধবিহার, মঙ্গলবাড়ির ভীমের পান্টি, ক্ষেতলালের আছরাঙ্গা দিঘি ও হিন্দা মসজিদ। কালাইয়ের নান্দাইল দিঘি, পাঁচবিবির পাথরঘাটা ও লকমা জমিদার বাড়ি; এমনকি পাগলা দেওয়ান বধ্যভূমিও আছে সে তালিকায়।

ইজান পঞ্চম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা দিয়েই নানা বাড়ি এসেছে। সে এখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে , একথা গর্ব করে বলেছে মামিকে।

'জানো মামি, আমি বড়ো হয়ে গেছি, আমি এখন হাই স্কুলে পড়ি, ষষ্ঠ শ্রেণিতে।' 'তাই নাকি! খুব ভালো খবর তো! আমাদের ইজান বড়ো হয়ে গেছে! আরও বড়ো হয়ে তুমি ডাক্তার হবে আর আমাদের চিকিৎসা করবে, তাই না' ? মামির কথায় তীব্রভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলে- 'না মামি, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার আমি হব না; আমি গবেষক হতে চাই'।

'সবাই তো ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় আর তুমি গবেষক হতে চাও কেন'? মামির প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবে ইজান। তারপর বলে- 'জানো মামি, আমাদের স্কুলের মেহরাব স্যার বলেছেন, আমাদের দেশে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বহু আছে কিন্তু দেশ ও

জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা করার মতো ভালো গবেষক খুব বেশি নেই। তাই আমি গবেষক হতে চাই। নানুর মতো বই লিখতে চাই'।

এত ছোট্ট ভাগনের মুখে পাকা পাকা কথা শুনে মামি তো অবাক ! মুখে হাসি ছড়িয়ে বলেন - 'আচ্ছা বলো তো, গবেষণা করে তুমি যে মোটা মোটা বই লিখবে সে বই কে পড়বে'?

'কেন ! তুমি পড়বে, মামা পড়বে, দেশের মানুষ পড়বে আর বিদেশের মানুষেরাও পড়বে। জানো মামি, স্যার বলেছেন, আমরা আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে খুব কম জানি। জানার চেষ্টাও করি না। যে জাতি নিজের গৌরবের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে উদাসীন, সে জাতি উন্নতি করতে পারে না। স্যার আরও বলেছেন, অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে হয়।'

'ওরেব্বাবা! সত্যিই তো তুমি অনেক বড়ো হয়ে গেছো, অনেক ভালো ভালো কথা শিখেছো'! অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে মামি বলেন।

'না না মামি, অত বড়ো এখনও হইনি, আরও কয়েক বছর পর আরও বড়ো হব'।

এমন সময় নানু ঘরে প্রবেশ করেই প্রশ্ন করেন , কী হয়েছে নানু ভাই, কে কার চেয়ে বড়ো হবে ?

'তোমাকে বলব না, মামিকে বলেছি...' বলেই দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ইজান।

শুরুতে পাঠ্যপুস্তক বাদে শুধুই নানু'র বই থেকে ছড়া পড়ত ইজান। ইদানিং বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়ে পড়ে অনেক কিছু জানতে পেরেছে। বই পড়ে পাহাড়পুরের ইতিহাস জেনেছে। জানতে পেরেছে যে, প্রাচীনকালে এই বাংলাসহ ভারত উপমহাদেশের বিশাল অঞ্চলজুড়ে বৌদ্ধধর্মের মানুষেরা বসবাস করত। রাজা-মহারাজারাও বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতে পাল বংশের রাজা ধর্মপাল পাহাড়পুরের সোমপুর বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এটি বৌদ্ধধর্মের মানুষদের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। বলা যায়, সেকালের বিশ্ববিদ্যালয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বৌদ্ধধর্মের মানুষেরা সোমপুর বৌদ্ধবিহারে এসে শিক্ষাগ্রহণ করতেন।

পাহাড়পুর নওগাঁ জেলার অংশ হলেও জয়পুরহাট জেলা শহর থেকে মাত্র ১৪ কি.মি. দূরত্বে এর অবস্থান।

রাতে মামাতো ভাই ইলহানের সাথে এক ঘরে এক চৌকিতে ঘুমিয়ে পড়ল ইজান। মধ্যরাতে মামা এসে ডেকে তুললেন। সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে পাহাড়পুরের সোমপুর বৌদ্ধবিহারে নিয়ে গেলেন। ততক্ষণে সকাল হয়ে গেছে। বৌদ্ধবিহারের ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকেই চক্ষু ছানাবড়া! কী সুন্দর জায়গা! চারদিকে সারি সারি কক্ষ আর মাঝখানে সুউচ্চ সুরম্য মন্দির ! ঠিক যেন সোনা দিয়ে মোড়ানো!

বৌদ্ধধর্মের বহু মানুষের সাথে ওর দেখা হলো। মামা ওদের সাথে ইজানের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওদের ভাষা কেমন যেন অদ্ভুত ! ঠিক বাংলা না তবে বাংলার মতো। দু'একটি শব্দ ছাড়া ইজান কিছুই বুঝতে পারছে না। অবাক ব্যাপার হলো, ওই মানুষগুলোর পোশাক একই রকম। কমলা রঙের লুঙ্গি, কমলা রঙের চাদর আর সকলের মাথা ন্যাড়া!

ওরা ইজানকে খুব আদর করল। অনেক কিছু খেতে দিল। এমন খাবার ইজান কখনোই খায়নি।

ওদেরই একজন লাল ঘোড়ায় চড়ে ইজানের কাছে এসে বলল, 'চলো ইজান, তোমাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরিয়ে দেখাই'... রাজি হয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসল ইজান আর ঘুরে ঘুরে বৌদ্ধদের বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে লাগল। কখনো জোরে কখনো ধীরে ধীরে লাল ঘোড়া ছুটে চলল। কিছু দূর যাওয়ার পর হঠাৎ কী যে হলো, ঘোড়াটি উড়তে শুরু করল! ভয় পেয়ে ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামতে গিয়েই ইজান চিৎপটাং !

ইজানের চিৎকারে ইলহানের ঘুম ভেঙে যায়। ইজানের চিৎকার আর ইলহানের ডাকাডাকিতে বাড়ির সবাই এ ঘরে এসে দেখে, ইজান চৌকি থেকে পড়ে গিয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ❑

শিশুসাহিত্যিক

নওগাঁ জেলার দর্শনীয় স্থান

শামস্ নূর

'প্রত্ন' শব্দের অর্থ অতি পুরাতন বা প্রাচীন। বস্তুগত নিদর্শনের ভিত্তিতে অতীত পুনর্নির্মাণ করার বিজ্ঞানই হলো প্রত্নতত্ত্ব। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হলো প্রাচীনকালে মানুষের তৈরি বা ব্যবহৃত বস্তুগত অংশ বিশেষ, যা মাটির নিচে বা উপরে পাওয়া যায় এবং যা অতীতের সংস্কৃতি, সভ্যতা ও জীবনযাত্রার তথ্য বহন করে। এর মধ্যে প্রাচীন অট্টালিকা, মুদ্রা, গয়না, মাটির পাত্র, পাথরের মূর্তি ও অস্ত্র ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এগুলো একটি জাতির ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছাড়া মানুষের সাংস্কৃতিক বিকাশের অনেক ইতিহাস অজানা থেকে যেত। এগুলো প্রাচীন গৌরব ও জাতিসত্তার পরিচয় বহন করে। এইসব নিদর্শনগুলো ইতিহাস, নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার মূল উৎস। বাংলাদেশে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে বগুড়ার মহাস্থানগড়, কুমিল্লার ময়নামতি, নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বর এবং নওগাঁর পাহাড়পুর (সোমপুর বিহার)।

পৃথিবীর যে কয়টি প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে সেগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের নওগাঁ জেলায় রয়েছে উল্লেখযোগ্য কিছু নিদর্শন। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এই নিদর্শনগুলোকে বলা হয় সভ্যতার প্রধান সোপান। প্রাচীন বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিল্প, সাংস্কৃতিক তথা সামগ্রিক জীবন ধারায় এসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন চিহ্নিত হয়।





পতিসর কাচারিবাড়ি

পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার: পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার বা সোমপুর বিহার বা সোমপুর মহাবিহার বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার। পাল বংশের দ্বিতীয় রাজা শ্রী ধর্মপাল দেব (৭৮১-৮২১) অষ্টম শতকের শেষের দিকে বা নবম শতকে এই বিহার নির্মাণ করেছিলেন। পাহাড়পুরের আদি নাম ছিল সোমপুর। মোট ২৭ একর জমির উপর সোমপুর বিহার অবস্থিত। এটি এশিয়ার বৃহত্তম প্রাচীণ বৌদ্ধবিহার। বিহারটির আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ৯২২ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৯১৯ ফুট। মূল দালানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য ১৭৭টি কক্ষ ছিল। ৮০০ ভিক্ষু বসবাসের উপযোগী ছিল এই বিহারে। সোমপুর বিহার এশিয়া বিশেষ করে ব্রহ্মদেশ ও জাভার স্থাপত্যকলাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে এ বিহারটি ধ্বংস হয়ে প্রায় ৪০ একর জমি জুড়ে রূপ নিয়েছিল অনুচ্চ পাহাড়। এই বিশাল ঢিবি পাহাড়ের মতো লাগত বলে স্থানীয় লোকেরা পাহাড়পুর নামে আখ্যায়িত করে। ফলে সোমপুর নামটি হারিয়ে যায়। এই বৌদ্ধ বিহারটি নওগাঁ জেলার উত্তরে বদলগাছী উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত।

১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম এই বিশাল স্থাপনা আবিষ্কার করেন। খনন কার্যের ফলে সোমপুর বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসস্তূপ থেকে বাংলার প্রাচীন জনপথ বরেন্দ্র অঞ্চলের শিল্প, শিক্ষা, ধর্ম, অর্থ প্রভৃতি বিষয়ের সাক্ষ্য-চিহ্ন স্বরূপ বহু মূল্যবান প্রত্নসামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে প্রাচীন মুদ্রা, অলংকৃত ইট, পোড়ামাটির ফলক, ৬৩টি প্রস্তর ভাস্কর্য, তাম্র ও প্রস্তর লিপি ধাতব মূর্তি প্রভৃতি অন্যতম।

নওগাঁর পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার (সোমপুর মহাবিহার) ১৯৮৫ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান হিসেবে স্বীকৃতি পায় পাহাড়পুর। ইউনেস্কোর মতে পাহাড়পুর বিহার বা সোমপুর বৌদ্ধ বিহার দক্ষিণ হিমালয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার।

পতিসর কাচারিবাড়ি: নওগাঁর আত্রাই উপজেলার নাগর নদের তীরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পতিসর কাচারি বাড়ি বা কুঠিবাড়ি অবস্থিত। পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত কালীগ্রাম পরগণার জমিদারি দেখাশোনার জন্য কবিগুরু ১৮৯১ সালে সর্বপ্রথম পতিসরে আসেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৯০ সালে কুঠিবাড়ির দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৮৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ



কুসুম্বা জামে মসজিদ

ঠাকুর কালীগ্রাম পরগনা জমিদারির অন্তর্ভুক্ত করেন। পতিসর কালীগ্রাম পরগনার সদর দফতর। নওগাঁ, বগুড়া ও নাটোর জেলার ৬০০টি গ্রাম নিয়ে কালীগ্রাম পরগনা গঠিত। এর আয়তন ছিল ২৩০ বর্গমাইল। রাতোয়াল আর ভান্ডারগ্রাম আরও দুটি সাব কাছারি ছিল। রাতোয়াল পতিসর থেকে ১০ কিলোমিটার আর ভাণ্ডারগ্রাম ২০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের বাংলাদেশে ছিল তিনটি জমিদারি।

পতিসরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করে। পতিসরে বসেই কবি চিত্রা, পূর্ণিমা, সন্ধ্যা, গোরা, ঘরে-বাইরেসহ অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৩৭ সালের ২৭শে জুলাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষবারের মতো পতিসরে আসেন। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বুকে নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে পতিসর কুঠিবাড়ি।

কাছারি বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়বে রবি ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তি। এর ভাস্কর কণক কুমার পাঠান। ঘরগুলো কবির ব্যবহার্য বিভিন্ন তৈজসপত্র, নানারকম সামগ্রী, তাঁর হস্তলিপি আর বিভিন্ন ছবিতে পূর্ণ। আরো আছে একটি বাথটাব, একটি নোঙর, বিশাল আয়না, আরাম কেদারা, ওয়্যারড্রব, ঘড়ি, গ্লোব, সিন্দুক, খাজনা আদায়ের টেবিল, খাট, আলমারি ইত্যাদি।

কুসুম্বা জামে মসজিদঃ মসজিদের স্থাপত্য নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম মসজিদটি নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার কুসুম্বা গ্রামে অবস্থিত। নওগাঁ জেলা শহর থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার এবং মান্দা উপজেলা থেকে মাত্র ৪ কিলোমিটার দূরত্বে মসজিদটি অবস্থিত।

মুসলিম স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন প্রায় ৪৬৫ বছরের পুরনো এই পুরাকীর্তির পুরোটাই পাথরে মোড়ানো। দেয়াল, মিনার এবং গম্বুজে নকশা খোদাই করা। এই মসজিদটি প্রতিনিয়ত আকৃষ্ট করছে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের। বাংলাদেশের পাঁচ টাকার কাগজের নোটে মুদ্রিত এ মসজিদের দেয়ালজুড়ে রয়েছে প্রাচীন টেরাকোটার দৃষ্টিনন্দন কারুকার্য। মিহরাবে রয়েছে বিচিত্র ফুল, লতাপাতা, ঝুলন্ত শিকল ও মনোরম শিল্পকর্ম। চারকোণা

আকৃতির কালো ও ধূসর পাথর এবং পোড়ামাটির সংমিশ্রণে নির্মিত এই মসজিদের দৈর্ঘ্য ৫৮ ফুট এবং প্রস্থ ৪২ ফুট। এর ছাদ গ্রামীণ চালাঘরের মতো তৈরি করা হয়েছে, যা উত্তর-দক্ষিণ দিকে সামান্য বাঁকানো। প্রায় ৬ ফুট পুরু দেয়ালের প্রতিটি কোণে রয়েছে আটকোণা আকৃতির চারটি মিনার। ছাদের উপর রয়েছে গোলাকৃতির মোট ছয়টি গম্বুজ। মসজিদের ভেতরে প্রবেশের আগেই নজরে আসে মসজিদ চত্বরে রাখা বাক্স আকৃতির একটি কালো পাথরে। উদ্ধারকৃত এ পাথরের গায়ে তোগড়া হরফে আরবি লিপিতে লেখা রয়েছে 'আল মালিকু মা হুমম মোকাররামা আবুল মোজাফফর হোসেন শাহ বিন সৈয়দ আশরাফ আল হোসেন। এ থেকে বোঝা যায় পাথরটি হুসেন শাহের স্মৃতি বিজড়িত।

প্রাচীরবেষ্টিত এ মসজিদের সামনেই রয়েছে ৭৭ বিঘা আয়তনের সুবিশাল এক দিঘি, যেটি এখন কুসুম্বা দিঘি নামে পরিচিত। প্রায় ১২০০ ফুট লম্বা ও ৯০০ ফুট প্রশস্ত এই দিঘি। কথিত আছে, এ দিঘির তলদেশে পারদ মিশ্রিত থাকায় পানিতে কচুরিপানা বা অন্য কোনো আগাছা জন্মে না। দিঘিতে নামার জন্য দুটি দৃষ্টিনন্দন সিঁড়ি রয়েছে।

ইতিহাস অনুযায়ী, কুসুম্বা শাহী মসজিদের মূল স্থাপনা নির্মাণ ৯১০ হিজরিতে শুরু হয়। দীর্ঘ ৫৬ বছর পর এ মসজিদের নির্মাণকাজ শেষ হয় ৯৬৬ হিজরিতে। ১৫৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আফগান বংশের শাসক গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের শাসনামলে সুলায়মান নামে এক ব্যক্তি এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নির্মিত একটি উঁচু আসন এখনো দেখা যায়। কথিত আছে- এক সময় ওই আসনে বসেই বিচার কাজ পরিচালনা করতেন তৎকালীন কাজিরা। বর্তমানে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর মসজিদটির সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে। ❑

উপপরিচালক, বাংলা একাডেমি

পাহাড়পুরের ধ্বনি

মোহাম্মদ ফারুক আহমেদ

প্রাচীন ইটের স্তূপ দাঁড়ায়
পাহাড়পুর ইতিহাস গড়ায়
বৌদ্ধ বিহার নীরব কথা
সময়ের বুকে লেখা ব্যথা।

সূর্যের আলো দেয়ালে পড়ে
অতীত যেন সামনে ঝড়ে
শত বছরের গল্প বলে
নীরব ধ্বনি বাতাসে দোলে।

পথিক আসে দূর দেশ থেকে
ইতিহাস দেখে মুগ্ধ চোখে
প্রতিটি ইটে লুকানো গান
মানবতার অমর টান।

এই স্থান শেখায় জ্ঞান
মানুষ গড়ার মহা দান
এই পথে ডাকে মন
ইতিহাসে ভরা এই ভুবন।







খুলনা ভ্রমণের হাতছানি

তাজিম মাহমুদ

বন্ধুরা, চলো না আমাদের দেশের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে ঘুরে আসি। প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত অপরূপ সৌন্দর্যের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলা খুলনা থেকে শুরু করা যাক। এ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮২ সালে। খুলনা পৌরসভা ঘোষণা করা হয় ১৮৮৪ সালে, আর সিটি করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ৬ই আগস্ট, ১৯৯০ সালে। এই জেলা শিল্প, বাণিজ্য, প্রকৃতি এবং লোকসংস্কৃতির একটি অভূতপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি করেছে। চিংড়ি শিল্প এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্প রয়েছে এখানে। রূপসা, ভৈরব, চিত্রা, পশুর, কপোতাক্ষসহ আরো অনেক নদী এ জেলার ব্যাবসা আর পর্যটনকে সমৃদ্ধ করেছে। খুলনা জেলার কয়েকটি দর্শনীয় স্থানসহ সুন্দরবন কেন্দ্রিক পর্যটন এলাকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে তুলে ধরছি।

সুন্দরবনঃ খুলনা জেলার দর্শনীয় স্থানের কথা বললে প্রথমে আসে পৃথিবী বিখ্যাত ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের কথা। এ বনটি শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারত জুড়েও অবস্থিত। বাংলাদেশের সুন্দরবন খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী এবং বরগুনার প্রায় ৬,০১৭ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে আছে। ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিশ্বের ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ সুন্দরবনকে জীব ও উদ্ভিদ জাদুঘর বলা যায়। প্রচুর সুন্দরী গাছ রয়েছে বলে সুন্দরী বৃক্ষের নামানুসারে এই বনের নাম হয়েছে সুন্দরবন।

সুন্দরবনের দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে করমজল, হারবাড়িয়া, কচিখালি, কটকা, জামতলা, হিরন পয়েন্ট, দুবলার চর উল্লেখযোগ্য। বনবিভাগের অনুমতি নিয়ে সুন্দরবনের কয়েকটি জায়গায় যাওয়া যায়। সুন্দরবনে ৩৫০ প্রজাতির উদ্ভিদ, ১২০ প্রজাতির মাছ, ২৭০ প্রজাতির পাখি, ৪২ প্রজাতির প্রাণী, ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ এবং আট প্রজাতির উভচর পাখি বাস করে।

করমজল পর্যটন কেন্দ্রঃ সুন্দরবনের অন্যতম দর্শনীয় স্থান হলো করমজল পর্যটন কেন্দ্র। এটি সুন্দরবনের পশুর নদীর তীরে অবস্থিত। বনবিভাগের তত্ত্বাবধানে মংলা সমুদ্রবন্দর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে ৩০ হেক্টর জমির উপর পর্যটন কেন্দ্রটি তৈরি হয়েছে। এখানকার মিনি চিড়িয়াখানায় দর্শনার্থীরা কীটপতঙ্গ, পাখি, সরীসৃপ এবং ১২০ প্রজাতির মাছ পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পায়। এছাড়াও এখানে রয়েছে কাঠের ট্রেইল, টাওয়ার। বাংলাদেশের কুমিরের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজনন কেন্দ্র রয়েছে করমজলে।

কটকা সমুদ্রসৈকতঃ কটকা সমুদ্রসৈকতটি জামতলা সমুদ্রসৈকত হিসেবে পরিচিত। মংলা বন্দর থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। সুন্দরবনের



প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য কটকাতে রয়েছে ৪০ ফুট উঁচু একটি ওয়াচ টাওয়ার। সূর্যাস্ত দেখার জন্য এই সমুদ্রসৈকত একটি আদর্শ স্থান। বড়ো জাহাজগুলো এখানে নোঙর করতে হয়।



হারবাড়িয়াঃ মংলা থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে, পশুর নদীর তীরে চাঁদপাই রেঞ্জের নৈসর্গিক শোভামণ্ডিত হাড়বাড়িয়া। এখানে কাঠের ট্রেইল, পুল পেরিয়ে গোলঘরে বসে পর্যটকগণ সুন্দরবনের আকর্ষণীয় সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন।

পুটনী দ্বীপঃ দুবলার চরের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সুন্দরবন অঞ্চলের পুটনী

দ্বীপের বাসিন্দারা এলাকাটিকে দ্বীপচর বলে। চরটি প্রায় ১০ বর্গকিলোমিটারের একটি অঞ্চল জুড়ে যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২ মিটার উপরে। চরে বহু বিপন্ন প্রজাতির পাখি, চামচঠুঁটো বাটান ও ইউরেশীয় ঝিনুকখোরের দেখা মিলে। আর ভাগ্য ভালো হলে চরের পাশের নদীতে দেখা মিলবে ইরাবতী ডলফিনের। এখানে কোনো বাঘের উপদ্রব নেই। পুটনী দ্বীপ যেতে বনবিভাগের অনুমতি নিতে হবে। সেইসাথে বনরক্ষীদেরও সাথে নিতে হবে।

হিরণ পয়েন্টঃ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের দক্ষিণাংশে খুলনা অঞ্চলের কুঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ লোনা পানির বন সুন্দরবনের দক্ষিণাংশে একটি সংরক্ষিত অভয়ারণ্য। ইউনেস্কো ঘোষিত অন্যতম বিশ্ব ঐতিহ্য হিরণ পয়েন্টের আরেক নাম নীলকমল। অভয়ারণ্য হওয়ায় হিরণ পয়েন্টে সহজেই বানর, হরিণ, বাঘসহ নানা প্রজাতির বন্যপ্রাণী, সরীসৃপ ও পাখিরা নিজেদের নিরাপদ প্রাকৃতিক আবাসস্থলে পরিণত করেছে। এখানে যেতে অবশ্যই বনবিভাগের অনুমতি নিতে হয়। ওয়াচ টাওয়ার থেকেও সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার ব্যবস্থা রয়েছে।

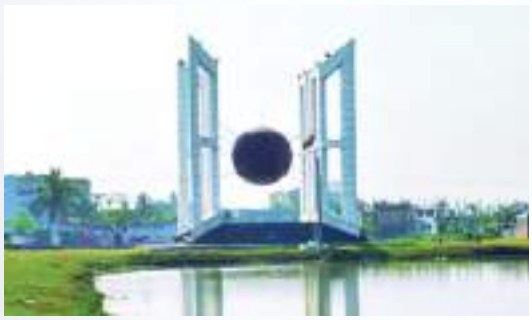
দুবলার চরঃ সুন্দরবনের সর্ব দক্ষিণের দ্বীপ। এই জায়গার ভ্রমণে দেখা যাবে বন্যপ্রাণীরাও ভ্রমণ পিপাসুদের অভিবাদন জানাচ্ছে। হরিণের অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা মায়াবি আহ্বান, গাছের ডালে বানরের লম্ফঝম্ফ, উঁচু ডালে বসে থাকা শঙ্খচিল, নয়নাভিরাম পাখির ঝাঁক, সবুজ পাতার আড়ালে চুপ করে বসে থাকা বাহারি মাছরাঙা, ভোঁদড়ের ডুবসাঁতার, পানির উপর ডলফিনের লাফিয়ে উঠা, কুমিরের রোদ পোহানো, হঠাৎ নদীর কিনারে রাজকীয় আভিজাত্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা রয়েল বেঙ্গল টাইগার ভ্রমণ পিপাসুকে বারবার সুন্দরবনে যেতে আকৃষ্ট করবে। এ যেন বিধাতার এক অনন্য সৃষ্টি।

ভূতিয়ার পদ্ম বিলঃ খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলায় রয়েছে পদ্ম ফুল সমৃদ্ধ ভূতিয়ার পদ্ম বিল। প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য এই পদ্ম বিল যেন এক স্বর্গপুরী। হাজার হাজার পদ্ম ফুল ফোটে সমগ্র বিল জুড়ে। সকাল ৬টা থেকে সাড়ে ৬টা পর্যন্ত পদ্ম ফুল দেখার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।



খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরঃ খুলনা জেলায় ১৯৯৮ সালে শিববাড়ি মোড়ে গড়ে তোলা হয় দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাদুঘর। এটি খুলনার দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে একটি। এ জাদুঘরে আছে উলুঘ খান-ই-জাহানের সমাধি, গুপ্ত, পাল, সেন ও ব্রিটিশ আমলে প্রাপ্ত কষ্টিপাথর, পুরাকীর্তি, পোড়ামাটি ও কালোপাথরের মূর্তিও খুলনা জেলার নানা স্থানের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

গল্লামারী স্মৃতিসৌধঃ মুক্তিযুদ্ধের ভয়ানক স্মৃতির স্থান হলো গল্লামারী। পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নিহতদের স্মরণে স্মৃতিসৌধ রয়েছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের বিপরীতে ময়ূর নদীর তীরে।



শিরোমণি স্মৃতিসৌধঃ ১৩-১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই হয়েছিল শিরোমণিতে। সেই যুদ্ধের স্মৃতিসৌধ রয়েছে খুলনা যশোর রোডে যেতে, ক্যান্টনমেন্টের পাশে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরালয়

খুলনা শহর থেকে মাত্র ১৯ কিলোমিটার দূরত্বে ফুলতলা উপজেলার দক্ষিণডিহি গ্রামে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরালয়। বর্তমানে এটি 'রবীন্দ্র কমপ্লেক্স' নামে পরিচিত। এখানে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর পত্নীর আবক্ষ ভাস্কর্য, দ্বিতল ভবন, ঘন সবুজ বাগান।

তাহলে বন্ধুরা, এবার চলো খুলনার আকর্ষণীয় সবকিছু দেখতে বেরিয়ে পড়ি যে-কোনো ছুটিতে।

তথ্যসূত্রঃ

১. মো. সিরাজুল ইসলাম, সুন্দরবনের প্রাণি-সম্পদ, সুন্দরবনের ইতিহাস-২, গতিধারা, ফেব্রুয়ারি, ২০১২, পৃ:৩৩৩-৩৪৩।
২. ড. মিজানুর রহমান, খুলনার পুরাকীর্তি, ২০১৭
৩. সুন্দরবন বনবিভাগের প্রচার পুস্তিকা।
৪. অন্তর্জাল থেকে নেওয়া তথ্য। ❑

শিক্ষার্থী, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সুন্দরবন

মোহাম্মদ আদনান আহমেদ

ঘন সবুজ বনের মাঝে
আছে অনেক নদীর বাঁক,
সুন্দরবন আমাদের মাঝে
চির অমর হয়ে থাক।

গাছের ছায়া পড়ে নদীর বুকে,
পাখিরা গান গায় আনন্দ সুখে।
দূরে দেখা যায় হরিণের পাল
মধু সংগ্রহে ব্যস্ত মৌয়াল।

সুন্দরবনই আটকে দেয়
সাগরের প্রাকৃতিক বাণ
তাই তো বলি সুন্দরবন!
সে তো বাংলাদেশের প্রাণ।

একাদশ শ্রেণি, রাঙামাটি সরকারি কলেজ





ভ্রমণের টুকিটাকি

মেজবাউল হক

জীবনকে উপভোগ করার অন্যতম সেরা একটি উপায় হলো ভ্রমণ। ভ্রমণের জন্য আমরা অনেক পরিকল্পনা করে থাকলেও ছোটো কিছু ভুলের কারণে পুরো আনন্দটাই মাটি হয়ে যেতে পারে। ভ্রমণ প্রাণবন্ত ও আনন্দময় করতে কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় জানতে হবে। তাই ভ্রমণের আগে ও ভ্রমণের সময় গুরুত্বপূর্ণ কিছু টিপস জেনে নেওয়া যাক।

- ❑ প্রথমে ট্যুরের একটি খসড়া প্ল্যান করতে হবে। এতে অনেক সময় বাঁচবে, ভ্রমণও সহজ হবে।
- ❑ যাওয়ার সময় ব্যাগ যতটা সম্ভব হালকা রাখতে হবে। অপ্রয়োজনীয় জিনিস নেওয়া যাবে না তবে পরিধেয় কাপড়গুলো ভালোভাবে গুছিয়ে নিতে হবে।
- ❑ সাথে সবসময় হালকা শুকনো খাবার ও পানি রাখা অত্যন্ত জরুরি।
- ❑ ভ্রমণ স্থানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। ভ্রমণের স্থান সম্পর্কে না জানলে অনেক সময় অনেক হয়রানির শিকার হতে হয়।
- ❑ আবহাওয়া অনুযায়ী তথ্য জেনে পরার কাপড় গোছানো যেতে পারে। শীতে ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত শীতের পোশাক বাছাই করতে হবে।
- ❑ ভ্রমণের জন্য ক্যামেরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্সট্রা ব্যাটারি, মেমোরি কার্ড সঙ্গে নেওয়া যেতে পারে।
- ❑ মোবাইল ও ল্যাপটপ নিলে অবশ্যই চার্জারটি লাগেজের পকেটযুক্ত ব্যাগে রাখা যেতে পারে।
- ❑ সর্দি-কাশি থেকে মুক্ত থাকতে চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে জরুরি ওষুধ সঙ্গে নিতে হবে।
- ❑ পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে চাইলে, নিজেকে হালকা রাখতে হবে। ভারী ব্যাগ ব্যবহার করা যাবে না। সাথে একজন পেশাদার গাইড রাখাটা নিরাপদ।
- ❑ ভ্রমণে গেলে যতই শীত হোক পানির বোতল রাখতে ভুললে চলবে না। পারলে কিছু ফলের রসও রাখা যেতে পারে।
- ❑ অতি উৎসাহী হয়ে ঝরনা, লেক, সমুদ্র বা অন্য যে-কোনো উৎস থেকে চট করে পানি মুখে দেওয়া উচিত নয়।
- ❑ অতিরিক্ত ঝাল কিংবা মশলা দেওয়া খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে। অস্বাস্থ্যকর খাবার যতই মুখরোচক হোক এড়িয়ে চলা ভালো।
- ❑ যাত্রার আগে ভরপেট না খাওয়াই ভালো।
- ❑ সঙ্গে বাড়তি মাস্ক রাখা ভালো।
- ❑ প্রচণ্ড রোদে অনেক সময় শুধু পানি আপনাকে ক্লান্তি এবং ডি-হাইড্রেশন থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। তাই সাথে করে খাবার স্যালাইন নিতে হবে।
- ❑ প্রচণ্ড রোদে একমাত্র ভরসা হচ্ছে সানগ্লাস। তাছাড়া ছাতা, ক্যাপ ও সানস্ক্রিন সাথে রাখা যেতে পারে।
- ❑ ভ্রমণে যাবার সময় ফাস্ট এইড বক্স নিতে ভুল করা যাবে না।

গল্প

রিমি আর মালার সমুদ্র ভ্রমণ

শাম্মী তুলতুল

নতুন বছর চলে এল। রিমি আর মালা দুই বোন প্ল্যান করছিল কী করবে না করবে। স্কুল বন্ধ। নতুন ক্লাস শুরু হতে দেরি আছে। তারা ২০২৬ সালে ক্লাস ফাইভে উঠল। তারা ভাবল নতুন বছরে কোথাও যাবে। কিন্তু কোথায় যাবে এটা মাথায় আসল না। তাই বাবার কাছে গেল।

বাবাকে রিমি বলল, বাবা আমরা ঘুরতে যেতে চাই। কিন্তু কোথায় যাব বুঝতে পারছি না।

বাবা তখন মেয়েকে কোলে বসিয়ে বললেন, তাহলে দূরে শহরের বাইরে ঘুরতে যাই চল।

কিন্তু মা শুনেই বললেন, রিমির ঠান্ডা লেগেছে। এখন দূরে যাওয়া যাবে না। সেজন্য আর কোনো কথা হলো না। এদিকে ছোটো খালামনি বেড়াতে আসলেন বাসায়। কিন্তু এসে দেখেন দুই ভাগনির মন খারাপ। বোনের কাছে সব জানতে পেরে খালা তাদের বললেন, কাছেই পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত। এটা আমাদের চট্টগ্রামের খুব বিখ্যাত জায়গা, সেখানেই যাব।

মা বললেন, সত্যি বলেছিস তো। আমি একদম মাথায় আনিনি। ওরা একবারও সেখানে যায়নি।

খালা বললেন, আমরা সবকিছু নিয়ে যাব রান্না করে। পুরো জায়গা ঘুরে বেড়াবো আর ছবি তুলব।

তাহলে পরশু যাব ঠিক আছে? মা মাথা নেড়ে সায় দিল। মিলি আর মালা মিলে ঠিক করছিল কী কী করবে, কী জামা পরবে, কী খাবে, কী নিয়ে যাবে সাথে করে। এদিকে খালা আর মা ঠিক করছে কী কী খাবার রান্না করে নিয়ে যাবেন।

খালা বলেন চিকেন বিরিয়ানি ভালো হবে, সাথে ডিম আর সালাদ। বেশি ঝামেলা করার দরকার নেই।

মা বলেন হ্যাঁ, তুই ঠিক বলেছিস তাড়াতাড়ি যেতে পারব। দিনটি চলে এল। মা-খালা রান্না-বান্না করার



জন্য জলদি ঘুম থেকে উঠে পরলেন। রিমি আর মালারও ঘুম ভাঙল। তারা নাকে মজার বিরিয়ানির ঘ্রাণ পেল।

তারা রেডি হয়ে বাবাকে ঘুম থেকে তুলে দিল। এদিকে মায়ের রান্না শেষ। ব্যাগ গুছিয়ে নিলাম। বিচ যেহেতু একটু দূরে যেতে সময় লাগবে তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পরল সবাই। চট্টগ্রাম শহর থেকে সি বিচ যেতে জ্যাম না হলে এক ঘণ্টা লাগে। আর যদি ফ্লাইওভার দিয়ে যাওয়া হয় তাহলে এক ঘণ্টার চেয়ে কম লাগে। উবার ঠিক করে ফ্লাইওভার দিয়েই রওয়ানা দিলাম। এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম পতেঙ্গায়। সমুদ্রের কাছাকাছি ছায়াতে চাদর বিছিয়ে সব জিনিসপত্তর একসাথে রাখা হলো। সবাই বসল। সবাই মিলে সকালের নাশতা সারল। মা ফ্লাস্কে গরম গরম চা বানিয়ে এনেছিলেন। বসে সবাই হালকা নাশতা-চা খেলাম। এবার ঘোরার পালা। একটু রোদ গড়াতেই সমুদ্রের পাড়ে হাঁটা ধরলাম।

রিমি বলল, ইশ! কী সুন্দর বাতাস। রিমি আর মালা কত্ত খুশি। তারা সমুদ্রের কাছাকাছি গেল খালার হাত ধরে। মা ভয় পাচ্ছিলেন।

খালা বললেন, বেশি দূরে যাব না। সামান্য পানির কাছে পা ভেজাবো। পায়ের কাছে পানি একবার আসে আবার যায়। সমুদ্রের শো- শো শব্দ শুনে রিমি আর মালা চমকে যায়। সবাই সেখানে অনেক ছবি তুলল। সমুদ্রের আশপাশে অনেক শামুক আর ঝিনুকের দোকান আছে। বাবা তাদের ঝিনুকের মালা কিনে দিল। সেখানে দেখা হয়ে গেল তাদের বান্ধবী ঝুমুরের সাথে। সেও বেড়াতে এসেছে তাদের মতো মা-বাবার সাথে। তারা একসাথে অনেক গল্প করল।

প্রায় বিকেল হয়ে সূর্য ডুবু ডুবু, এবার যাওয়ার পালা। রিমি, মিলির বান্ধবী, ঝুমু, তার মা সবাই মিলে একসাথে নাশতা করল। এতে রিমি আর মালার কী যে আনন্দ হচ্ছিল। তাদের এমন আনন্দ দেখে বাবা-মা অনেক খুশি। সবাই সব কিছু গুছিয়ে পতেঙ্গা সি বিচে ঘোরা শেষ করে বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল। ❑

শিশুসাহিত্যিক



কুয়াকাটার সূর্য

মোশারফ হোসেন

সূর্য ওঠে সাগর বুকে,
কুয়াকাটা হাসে সুখে।
ভোরের আলো ঢেউয়ের খেলায়,
স্বপ্নেরা ভাসে জলের মেলায়।

বালুর পথে হেঁটে যায় মন,
প্রকৃতি যেন জীবনের ধন।
পাখির ডাকে ভোরের গান,
ভ্রমণ জাগায় প্রাণে প্রাণ।

সন্ধ্যাবেলায় সূর্য ডোবে,
সোনালি আলো, ঢেউয়ের রবে
সূর্য ডোবা লাল দিগন্ত,
ভ্রমণের সুখে নেই কোনো অন্ত।

রাতের আকাশ তারায় ভরা,
নীরব সাগর স্বপ্ন ধরা।
বাতাস বয়ে আনে প্রশান্তি,
সাগর পাড়ে দূরে যায় ক্লান্তি।

কুয়াকাটা ডাকে তাই,
প্রকৃতির প্রেমে হৃদয় পাই।
সূর্যোদয় সূর্যাস্ত একসাথে,
স্বপ্ন জাগে ভ্রমণ পথে।



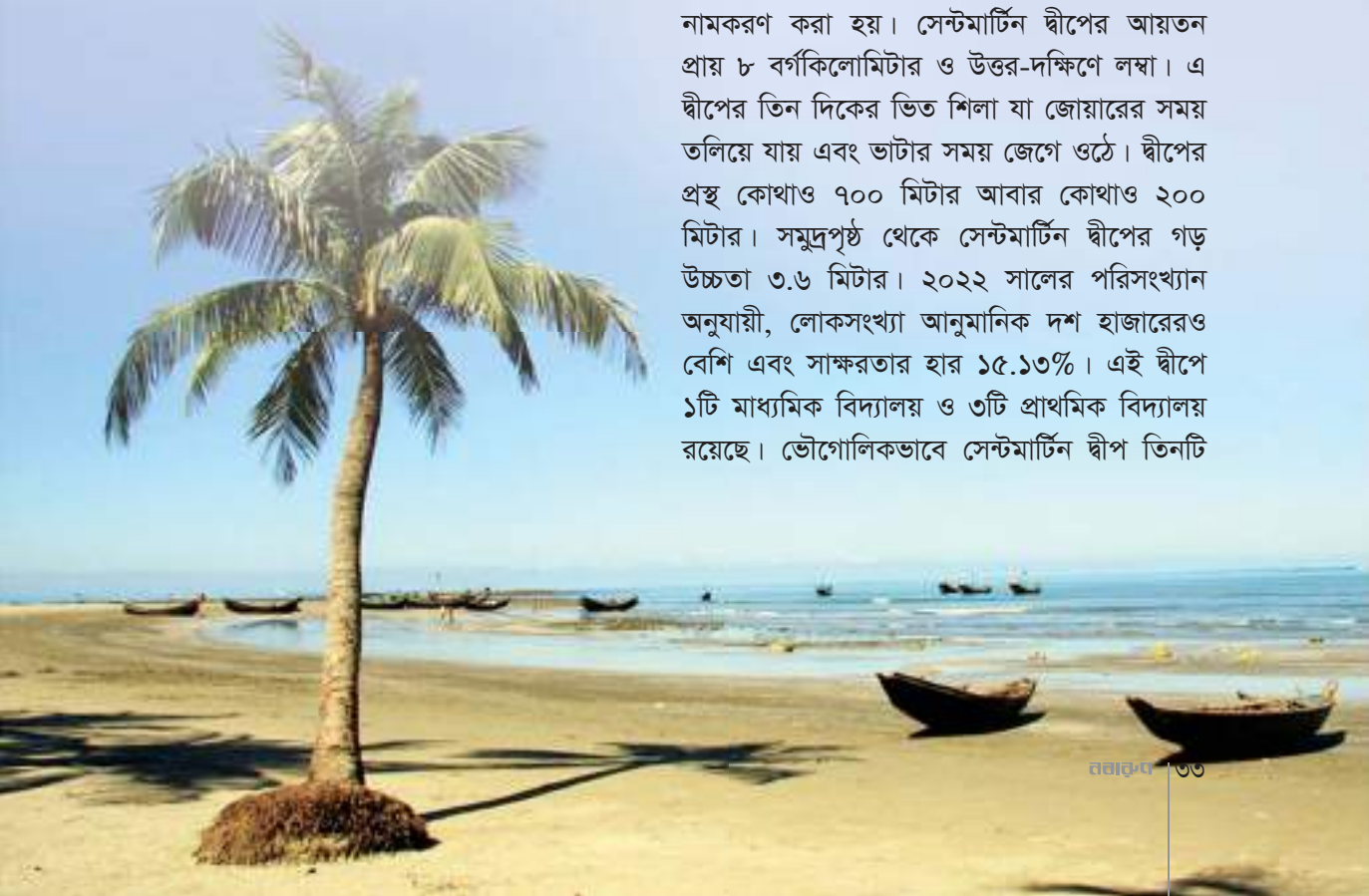
সেন্টমার্টিন দ্বীপ

এস এম মাসুদ

বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় পর্যটন স্থানগুলোর মধ্যে সেন্টমার্টিন দ্বীপ অন্যতম। সেন্টমার্টিন বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। এটি কক্সবাজার শহর থেকে প্রায় ১২০ কিলোমিটার, টেকনাফ থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং মায়ানমারের উপকূল হতে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে নাফ নদীর মোহনায় অবস্থিত। প্রচুর নারিকেল পাওয়া যায় বলে স্থানীয়ভাবে একে নারিকেল জিঞ্জিরাও বলা হয়ে থাকে। অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমণ্ডিত এ দ্বীপটি বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন স্থান হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। এর নীল জলরাশি, সাদা বালু এবং নারিকেল গাছের সারি পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এটি প্রবাল প্রাচীর, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য ও স্থানীয় জেলেদের জীবনযাত্রার কারণে বিখ্যাত। যদিও পরিবেশগত কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। তবে স্বচ্ছ নীল জলে সাঁতার, স্কিন ডাইভিং ও তাজা সামুদ্রিক মাছ পর্যটকদের কাছে অধিক জনপ্রিয়।

টেকনাফ থেকে নাফ নদী হয়ে বঙ্গোপসাগরের বুকে জাহাজে ভ্রমণ এবং সাথে থাকা সাদা রঙের গাংচিল এর দৃশ্য, যা মন ভালো করে দেওয়ার মতো। পড়ন্ত বিকেলে দ্বীপের চারপাশ ধরে সাইকেল চালানো এবং রাতের বেলা সমুদ্রের পাড়ে বসে জ্যোৎস্না উপভোগ করা এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। সাধারণত সেন্টমার্টিনে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত প্রবেশের অনুমতি থাকলেও ডিসেম্বর ও জানুয়ারি এই দুই মাস রাত্রিযাপনের অনুমতি থাকে। বাকি ৯ মাস স্থানীয়দের ট্রলার কিংবা স্পিডবোট দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। শীত মৌসুম ছাড়া বাকি সময় সাগর উত্তাল থাকে, তাই এই সময়ে ভ্রমণ নিরাপদ নয়।

ধারণা করা হয়, ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে দ্বীপটিকে যখন ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মার্টিনের নাম অনুসারে দ্বীপটির নামকরণ করা হয়। সেন্টমার্টিন দ্বীপের আয়তন প্রায় ৮ বর্গকিলোমিটার ও উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। এ দ্বীপের তিন দিকের ভিত শিলা যা জোয়ারের সময় তলিয়ে যায় এবং ভাটার সময় জেগে ওঠে। দ্বীপের প্রস্থ কোথাও ৭০০ মিটার আবার কোথাও ২০০ মিটার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সেন্টমার্টিন দ্বীপের গড় উচ্চতা ৩.৬ মিটার। ২০২২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, লোকসংখ্যা আনুমানিক দশ হাজারেরও বেশি এবং সাক্ষরতার হার ১৫.১৩%। এই দ্বীপে ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ভৌগোলিকভাবে সেন্টমার্টিন দ্বীপ তিনটি



অংশে বিভক্ত। উত্তর অংশকে বলা হয় নারিকেল জিঞ্জিরা বা উত্তর পাড়া, দক্ষিণাঞ্চলীয় অংশকে বলা হয় দক্ষিণ পাড়া এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তৃত একটি সংকীর্ণ লেজের মতো এলাকা যা গলাচিপা নামে পরিচিত। দ্বীপের দক্ষিণে ১০০ থেকে ৫০০ বর্গমিটার আয়তনের ছোটো দ্বীপ আছে যা স্থানীয়ভাবে ছেঁড়াদিয়া বা ছেঁড়া দ্বীপ নামে পরিচিত। এটি একটি জনশূন্য দ্বীপ। ভাটার সময় এই দ্বীপে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়, তবে জোয়ারের সময় নৌকা প্রয়োজন হয়।

সেন্টমার্টিন দ্বীপে প্রায় ৬৬ প্রজাতির প্রবাল, ১৮৭ প্রজাতির শামুক-ঝিনুক, ১৫৩ প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবাল, ১৫৭ প্রজাতির গুপ্তজীবী উদ্ভিদ, ২৪০ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ, ৪ প্রজাতির উভচর ও ১২০ প্রজাতির পাখি পাওয়া যায়। স্থানীয়ভাবে পেজালা নামে পরিচিত Sea weeds বা অ্যালগি (Algae) এক ধরনের সামুদ্রিক শৈবাল সেন্টমার্টিনে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এগুলো বিভিন্ন প্রজাতির হয়ে থাকে তবে লাল অ্যালগি (Red Algae) বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে জনপ্রিয়। এছাড়াও রয়েছে ১৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে স্পঞ্জ, শিল কাঁকড়া, সন্ন্যাসী শিল কাঁকড়া, লবস্টার ইত্যাদি। মাছের মধ্যে রয়েছে পরি মাছ, প্রজাপতি মাছ, বোল করাল, রাঙ্গা কই, সুঁই মাছ, লাল মাছ, উড়ুক্কু মাছ ইত্যাদি। সবুজ সাগর কাছিম ও জলপাইরঙা সাগর কাছিমসহ বিভিন্ন সামুদ্রিক কচ্ছপের ডিম পাড়ার জন্য জায়গাটি খ্যাত।

সেন্টমার্টিনের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ জিনিস হলো ডাব যা একাধারে মিষ্টি ও সুস্বাদু। যারা মাছ খেতে পছন্দ করেন তাদের জন্য সেন্টমার্টিন কোরাল, সুন্দরি পোয়া, ইলিশ, রূপচাঁদা, লবস্টার, কালাচাঁদা ও কাঁকড়াসহ বিভিন্ন মাছের স্বাদের বাহার নিয়ে অপেক্ষা করছে। এছাড়াও এখানে রয়েছে অফুরন্ত লইট্টা, ছুরি, রূপচাঁদা, কাচকি, ছোটো চিংড়িসহ জানা অজানা শুঁটকি মাছের ভাণ্ডার। ফেব্রুয়ারি মাসে সেন্টমার্টিনে স্থানীয় তরমুজও পাওয়া যায়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অতিরিক্ত পর্যটন, প্লাস্টিক ও পলিথিন বর্জ্য, অপরিকল্পিত স্থপনা এবং শব্দদূষণের কারণে দ্বীপটির পরিবেশ হুমকির মুখে পড়েছে। সেন্টমার্টিন দ্বীপের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সরকার ও সাধারণ মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। সেন্টমার্টিন দ্বীপ শুধু একটি ভ্রমণকেন্দ্র নয়, এটি দেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই দ্বীপের সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব। ❑

সেন্টমার্টিনের সকাল

মো. মাহমুদুল কবীর (শামীম)

নরম বালুর পথে হেঁটে যায় মন
প্রকৃতির কাছে মেলে নতুন জীবন
নারিকেলের ছায়া পড়ে ঢেউয়ের তলে
শান্তির গান বাজে বাতাসের দোলে।

নীল জলে ভাসে ছোটো ছোটো নৌ-যান
দূর থেকে ভেসে আসে সাগরের কলতান
জীবনের ক্লান্তি মুছে যায় ধীরে
দ্বীপের নীরবতায় হৃদয় যায় ভরে।

রাত নামলে জ্বলে তারার আলো
দিনের বেলায় চিকচিক করে রূপালি বালু
সেন্টমার্টিনের বাতাসে বাজে ভ্রমণের মিষ্টি সুর
মনের মধ্যে ভ্রমণের আনন্দ থাকে ভরপুর।

এই দ্বীপ শেখায় শান্তির ভাষা
মনের ভিতর জাগায় নতুন আশা
সেন্টমার্টিন ডাকে নীরব গান
ভ্রমণের সুখে ভরে মানুষের প্রাণ।



ষাটগম্বুজ মসজিদের খলিফাতাবাদ

মুন্সী মো. নজরুল ইসলাম

বন্ধুরা, আজ থেকে পাঁচশত বছর আগে একজন সাহসী মুসলিম দরবেশ যোদ্ধা দিল্লি সালতানাতের শাসক প্রথম নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহের সনদ নিয়ে বাংলার নদীপথে দক্ষিণ পাণে এগিয়ে এসেছিলেন। সুন্দরবন আবাদ করে নদী তীরে জনবসতি, মসজিদ-দূর্গ গড়েছেন। স্থানীয় প্রশাসনিক কেন্দ্র গড়ে জনহিতকর কাজের সাথে মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছেন। যশোরের বারোবাজার, মুড়লি, কসবা থেকে অভয়নগর দিয়ে ফুলতলা আরো দক্ষিণে এগিয়ে ঘাঁটি করলেন খলিফাতাবাদে, (বা হাবেলি কসবা) যাকে এখন আমরা চিনি বাগেরহাট নামে। তাঁর আরেকটি দলের গতি হলো খুলনার কয়রা মুখে। ১৫০০ শতকের গোড়াতে এতদাঞ্চলে কতকগুলো নগর জনপদ গড়ে তুললেন শিষ্য পাঠিয়ে। বাগেরহাটে প্রশাসনিক কেন্দ্র, অনেকগুলো মসজিদ, পাকা বাড়িঘর, পুকুর-দিঘি খনন করে সাধারণের মন জয় করে নেওয়া সে ধর্মপ্রচারক পুরুষের নাম খান ই জাহান উলুখ খান। ভৈরব নদীর তীরবর্তী এক সময়ের জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটি প্রাচীন মানচিত্রে শুধু 'বাগির' বলে চিহ্নিত ছিল। ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে সেখানেই বাগেরহাট মহকুমা সদর স্থাপিত হলো। জেলা হলো ১৯৮৪ সালে।

চলো আমরা ঘুরে দেখি বাংলার প্রাচীন সে জনপদ, যা এখন ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব-ঐতিহ্য। ঢাকা থেকে ট্রেনে করে খুলনা নেমে দক্ষিণ-পূর্বে ৩০ কিলোমিটার গেলেই বাগেরহাট।

ষাট গম্বুজ মসজিদ : ষাট গম্বুজ মসজিদ বাগেরহাট জেলার খুলনা-বাগেরহাট মহাসড়কের পাশে সুন্দরঘোনা গ্রামে অবস্থিত। বাগেরহাট শহর থেকে ৭ কিলোমিটার দূরত্বে। পনেরো শতকে নির্মিত বাংলাদেশ ভূখণ্ডে অবস্থিত মধ্যযুগীয় মসজিদগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে বড়ো। মসজিদটির স্থাপত্যশৈলী খুবই চমৎকার। লাল পোড়ামাটির উপর বিভিন্ন রকমের নকশা করা স্থাপত্য শিল্পের এক অনন্য নিদর্শন। আর ডানে 'বাগেরহাট জাদুঘর'।

খান-ই-জাহানের আমলেই তুঘলকী ও জৌনপুরী স্থাপত্যকলার মিশেলে নির্মাণ করা হয় এই মসজিদ। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা মসজিদের আয়তন ১৫৯ ফুট-৭ ইঞ্চি × ১০৮ ফুট-৫ ইঞ্চি। ইটের তৈরি দেওয়ালগুলো ৮ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রশস্ত। এর চারকোণে ৪টি বিরাট আকারের মিনার আছে। কার্নিশগুলো বক্রাকার। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে আছে ১১টি প্রবেশ পথ। বক্রাকারের খিলানের দ্বারা দরজাগুলো নির্মিত। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ৭টি করে দরজা আছে। পাথরের তৈরি কেন্দ্রীয় বড়ো মেহরাবটির পাথরের উপর সুন্দর কারুকার্যের লতাপাতা, ফুল, জ্যামিতিক নকশার কিছু নিদর্শন এখনও আছে। দক্ষিণ-পূর্বকোণে উপরে ওঠার প্যাঁচানো সিঁড়ির নাম 'রওশনকোঠা', উত্তরপূর্ব কোণের সিঁড়ির নাম 'আন্ধারকোঠা'।

নাম ষাট গম্বুজ মসজিদ হলেও মসজিদের গম্বুজ কিন্তু ষাটটা নয়, ৮১টি। ছাদে আড়াআড়িভাবে এগারোটি এবং লম্বালম্বিভাবে সাতটি সারিতে মোট ৭৭টি এবং চারধারে বড়ো চারটি মোট ৮১টি। গম্বুজ ৮১টি হলেও ছাদের ভার বহনের জন্য সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত ৬০টি পাথরের কলাম বা স্তম্ভের (থামের) উপর প্রতিষ্ঠিত খিলান রয়েছে। ষাটটি খামের অস্তিত্ব থেকেই মসজিদটি অতীতে 'ষাটখাম্বজ' নামে পরিচিতি পেয়েছিল আর 'ষাটখাম্বজ' কথাটির কথ্যরূপ 'ষাটগম্বুজ' হয়ে গেছে।

খান-ই-জাহানের মাজার: বাগেরহাট শহরের ৭ কিলোমিটার উত্তরে সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরদিঘি বা খাঞ্জালি দিঘির উত্তর তীরে খান-ই-জাহানের মাজার বা সমাধি সৌধ। চারকোণে ৪টি স্তম্ভের বর্গাকারে নির্মিত এ সমাধি সৌধের প্রত্যেক বাহু ৪৬ ফুট লম্বা। চারকোণে ৪টি গোলাকার মিনার আছে। মাটি থেকে গম্বুজের চূড়া পর্যন্ত ইমারতের উচ্চতা ৪৭ ফুট। ইমারতটি দেখতে প্রায় অষ্ট কোণাকৃতির। এর কেন্দ্রস্থলে খান-ই-জাহানের সমাধি। পাথর ও নিচের দুই তাকের পাথরের উপর লেখাগুলোতে আছে বিভিন্ন কলেমা, আল্লাহর ৯৯ নাম, চার খলিফার নাম, কোরানশরিফের আয়াত, ফারসি কবিতা ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে ২টি শিলালিপিতে খান-ই-জাহানের মৃত্যু ও দাফনের তারিখ (মৃত্যু ২৫শে অক্টোবর, ১৪৫৯ খ্রি., ২৬শে জিলহজ্জ ৮৬৩ হিজরি, দাফন ২৬শে অক্টোবর ১৪৫৯ খ্রি., ২৭শে জিলহজ্জ ৮৬৩ হিজরি) খোদিত আছে।

ঠাকুরদিঘি বা খাঞ্জালির দিঘি: খান-ই-জাহানের মাজারের দক্ষিণে ষাট গম্বুজ মসজিদ থেকে ২.৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রয়েছে ঠাকুরদিঘি বা খাঞ্জালির দিঘি। আনুমানিক ২০০ বিঘা ভূমি জুড়ে এই দিঘির অবস্থান। এ দিঘির ঘাট প্রায় ৬০ ফুট প্রশস্ত এবং এতে ৩৮টি সিঁড়ি আছে। এ দিঘি খননের সঠিক তারিখ জানা যায়নি। অনেকদিন আগে দিঘিতে ধলাপাহাড়, কালাপাহাড় নামে কুমির ছিল। কুমির নিয়েও রয়েছে অনেক গল্প।





এক গম্বুজ মসজিদঃ ষাট গম্বুজ মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ৩১১ ফুট-৭ ইঞ্চি দূরে খুলনা বাগেরহাট হাইওয়ে লাগোয়া দক্ষিণ পাশে এক গম্বুজের মসজিদ আছে। গম্বুজটি অর্ধবৃত্তাকার। এর সালাত কোঠা বর্গাকারে নির্মিত, পরিমাপ ৩৮ফুট ১০ ইঞ্চি × ৩৮ ফুট ১০ ইঞ্চি। দেয়াল ৬ ফুট ১১ ইঞ্চি প্রশস্ত। চারকোণে ৪টি মিনার আছে। পূর্ব দেয়ালে রয়েছে ৩টি খিলান দরজা, উত্তর-দক্ষিণ দেয়ালে আছে ১টি করে খিলান দরজা। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ষাট গম্বুজের মতো। 'সিঙ্গাইর মসজিদ' নামে পরিচিত মসজিদটি একটি সংরক্ষিত পুরাকীর্তি।

ঘোড়াদিঘিঃ ষাট গম্বুজ মসজিদের মাত্র ২০মিটার বা ৬৫ ফুট ৬ ইঞ্চি দূরে রয়েছে বিরাট দিঘি। স্থানীয় নাম 'ঘোড়াদিঘি'। পূর্ব পশ্চিমে লম্বা এ দিঘির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯৬৮ ফুট - ৫ ইঞ্চি, প্রস্থ ১১৯৭ ফুট - ৫ ইঞ্চি। কথিত আছে, এই দিঘি খননের পর পানি আসছিল না। তখন খানজাহান আলী ঘোড়া নিয়ে নতুন খনন করা দিঘিতে নেমে চক্কর দেন। তারপর দিঘিতে পানি আসে। সেই থেকে এই দিঘির নাম হয়েছে ঘোড়াদিঘি।

বিবি বেগণি মসজিদঃ ষাট গম্বুজ মসজিদের আনুমানিক ৯০০ মিটার বা ২৯৫২ ফুট ৮ ইঞ্চি পশ্চিম-উত্তরে ষাটগম্বুজ ইউনিয়নের সুন্দরঘোনা গ্রামের শেষ প্রান্তে 'বিবি বেগণি মসজিদ' নামে একটি এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে। মসজিদটি বাইরের দিক থেকে ১৫.২০ মিটার বা ৪৯ ফুট ৯ ইঞ্চি বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। এটি ষাটগম্বুজ মসজিদের সমকালীন নিদর্শন এবং সংরক্ষিত পুরাকীর্তি।

রণবিজয়পুর মসজিদঃ খান-ই-জাহানের বসতবাড়ি থেকে প্রায় দেড় মাইল পূর্ব দিকে রাস্তার দক্ষিণ পাশে রণবিজয়পুর গ্রামে আছে এই মসজিদ। বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে ৫৬ ফুট এবং ভিতরের দিকে প্রায় ৩৬ ফুট লম্বা। ইটের তৈরি প্রাচীরগুলো ১০ ফুট প্রশস্ত। এর চারকোণে ৪টি গোলাকার মিনার আছে। পূর্ব দেয়ালে আছে ৩টি দরজা। উপরে আছে পেয়ালা আকারে নির্মিত একটি বড়ো ও উঁচু গম্বুজ। নিচের দিকে এই গম্বুজের ব্যাস ৩৬ ফুট। এত বড়ো খিলানওয়ালা মসজিদ বাংলাদেশে আর কোথাও নেই।

হোসেন শাহী মসজিদ : এবার চলো বাগেরহাট সদরে কারাপাড়া ইউনিয়নের কৃষ্ণনগর গ্রামে। খুলনা-বাগেরহাট পুরনো সড়ক ঘেঁষে একটি মধ্যযুগীয় মসজিদ আছে। আয়তাকার ভিত-পরিকল্পনায় নির্মিত এ মসজিদের দেয়ালগুলো ১.৭০ মিটার বা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি পুরু।

পূর্ব দেয়ালে পাঁচটি খিলান-দরজা রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালেও ২টি করে দরজা আছে। মসজিদের উপরে ২ সারিতে ১০টি ছোটো আকারের গম্বুজ আছে। স্থানীয় জনগণের বিশ্বাস, এটি সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ নির্মাণ করেছিলেন। তাই এর স্থানীয় নাম 'হোসেন শাহী মসজিদ'।

অযোধ্যা মঠঃ এই ইমারতটি 'কোদলা মঠ' নামেও পরিচিত। ষাট গম্বুজ মসজিদ থেকে ১০ কি.মি. বা ৬.২১ মাইল উত্তর-পশ্চিম এবং যাত্রাপুর রেলস্টেশন থেকে ৩ কি.মি. বা ১.৮৬ মাইল উত্তরে বারুইপাড়া ইউনিয়নের অযোধ্যা গ্রামের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। সম্পূর্ণ ইটের তৈরি, পূর্বমুখী, এককোঠা বিশিষ্ট ও উড়িষ্যার রেখদেউল আকৃতির ইমারত। এটি একটি সংরক্ষিত পুরাকীর্তি। পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমির জমিপিঠ থেকে ১৮.২৮মিটার বা ৬০ ফুট উঁচু। এর খিলান-নকশায় লতা, ফুল ও জ্যামিতিক অলংকরণে সুশোভিত। মেঝেটি ফাঁকা। অধিকাংশ গ্রামবাসীর মতে, এটি একটি স্মৃতিমঠ। এর নির্মাতা ছিলেন বারোভূঁইয়া নেতা ধুমঘাটের মহারাজা প্রতাপাদিত্য।

বাগেরহাটের পর্যটন স্পটগুলোর মধ্যে মাত্র কয়েকটির পরিচয় তোমাদের দিলাম। স্থানীয় ছোটো যানবাহনে চড়েই সবটা দেখে নিতে পারবে। প্রত্নসম্পদ দেখতে বিস্ময় জাগবে। চলো না বন্ধুরা, স্কুল ছুটি হলে বা শিক্ষাসফরে বেরিয়ে পড়ি মসজিদ, মাজার আর দিঘির খলিফাতাবাদে। আর মনের চোখ দিয়ে অনুভব করি পাঁচশ বছর আগেও এ অঞ্চলের জনপদ ছিল কত সমৃদ্ধ!

তথ্যসূত্রঃ

- শ্রী সতীশ চন্দ্র মিত্র,যশোহর খুলনার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ২০০১; দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৬৫
- সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, বাংলাদেশের মসজিদ, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭
- বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার, বৃহত্তর খুলনা, ১৯৯৬
- মো: মোশারফ হোসেন, বৃহত্তর খুলনার প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ, প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তর, ঢাকা,২০০৪
- ড.মিজানুর রহমান,খুলনার পুরাকীর্তি, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, নভেম্বর, ২০১৭
- অন্তর্জাল থেকে: ষাট গম্বুজ মসজিদ, ঘুরে এলাম ষাট গম্বুজ মসজিদ। ❑

শিশুসাহিত্যিক



অযোধ্যা মঠ



ঘুরে আসি পল্লিকবির গাঁয়ে

তামান্না ইয়াসমিন বৃষ্টি

বন্ধুরা, প্রিয় কবির ছড়ায় তোমরা পড়েছ-

> ‘আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা ফুল তুলিতে যাই
> ফুলের মালা গলায় দিয়ে মামার বাড়ি যাই।’

অথবা

> ‘তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে
> আমাদের ছোট গাঁয়’–

‘নিমন্ত্রণ’ কবিতার এই আহ্বান পল্লিকবি জসীম উদ্‌দীনের-সেকথা তোমরা সবাই জানো। আর কবির সে ডাকে এবার চলো দেখে আসি ১৮১৫ সালের পুরনো জেলা ফরিদপুর। ফরিদপুর শহরের প্রান্তে অম্বিকাপুর ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামে কবির বাড়ি থেকেই বেড়ানো শুরু করি।

আমাদের কবি জসীম উদদীন জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৩ সালের ১লা জানুয়ারি ফরিদপুর সদরের তাম্বুলখানা গ্রামে নানার বাড়িতে। ১৯৭৬ সালের ১৪ই মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে সমাহিত করা হয় ফরিদপুর শহরতলীর গোবিন্দপুর গ্রামে কুমার নদের পাড়ে পারিবারিক কবরস্থানে এক ডালিম গাছের নিচে। ছায়া-সুনিবিড়, শান্ত পরিবেশে শুয়ে আছেন শ্যামল বাংলার এই কবি। ‘কবর’ কবিতায় কবি ডালিম গাছের নিচে কবরের বর্ণনা দিয়েছিলেন যেভাবে-

> ‘এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম
> গাছের তলে
> তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের
> জলে।’

‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’, ‘নক্সী কাঁথার মাঠ’, ‘সুচয়নী’, ‘বেদের মেয়ে’, ‘বাঙালীর হাসির গল্প’, ‘যে দেশে মানুষ বড়’-এমন অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন পল্লিকবি। ‘কবর’ ও ‘আসমানী’ আজও পাঠকের মুখে মুখে ফেরে।

কবির বাড়ির মাটির গন্ধমাখা উঠোন, চারদিকে ছড়িয়ে থাকা পাখির কাকলি, পুরনো টিনের ঘর,

কাঠের দরজা এবং সাদামাটা নির্মাণশৈলী- সবটাই যেন জীবন্ত গল্প বলে। শত বছর আগে এখানে কবি ও তাঁর পরিবারের জীবনযাপন কেমন ছিল, তাঁর অনুভব মেলে প্রতিটি কোণে।

কবির বাড়ির টিনের ঘরের বেড়ার সঙ্গে কবির বিভিন্ন লেখা, ছোটো ছোটো গল্প, স্মৃতিকথা ও বিভিন্ন চিঠি এবং আলোকচিত্র ব্যানারে বড়ো প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

কবির বাড়ির পাশেই সরকারি উদ্যোগে চার একর জমির ওপর গড়ে তোলা হয়েছে 'পল্লিকবি জসীম উদ্‌দীন কমপ্লেক্স ও সংগ্রহশালা', যা শুধু একটি স্থাপনা নয় বরং বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন ও সাহিত্যের এক জ্বলন্ত স্মৃতিকেন্দ্র।

এখানে রয়েছে কবির ব্যবহৃত ব্যক্তিগত সামগ্রী, পল্লিকবিকে প্রশংসা করে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজ হাতে লেখা চিঠি, কাজী নজরুল ইসলামের হাতে লেখা চিঠি, কবির হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি, বিরল আলোকচিত্র, প্রকাশিত বই, নথি ও অন্যান্য স্মারক।

পাতরাইল দিঘিরপাড় আউলিয়া মসজিদঃ ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার আজিমনগর ইউনিয়নের প্রত্যন্ত পাতরাইল দিঘিরপাড় গ্রামে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় ছয়শো বছরের পুরনো একটি মসজিদ। 'পাতরাইল দিঘিরপাড় আউলিয়া মসজিদ' নামের এই স্থাপনা বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীন সংরক্ষিত প্রত্ননিদর্শন। ইতিহাসবিদদের ধারণা, ১৩৯৩ থেকে ১৪১০ খ্রিষ্টাব্দের। আয়তাকার মসজিদটি বহু গম্বুজবিশিষ্ট। এটির মূল প্রবেশদ্বার পূর্ব দিকে। ভেতরের ছাদে সমান উচ্চতার ১০টি গম্বুজ রয়েছে এবং ছাদটি সামান্য বাঁকানো। মসজিদের পূর্ব দিকে পাঁচটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুটি করে প্রবেশপথ আছে। প্রতিটি দেয়ালের প্রস্থ প্রায় দুই মিটার এবং নামাজ কক্ষের আয়তন ২১ দশমিক ৭৯ বাই ৮ দশমিক ৬ মিটার। মসজিদের সর্বোচ্চ উচ্চতা প্রায় ৬ দশমিক ৫ মিটার। দেয়ালে আয়তাকার টেরাকোটা নকশার অলংকরণ রয়েছে।

সাতৈর মসজিদঃ ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকা গৌরবময় ঐতিহ্যের অন্যতম সাতৈর মসজিদ বাংলাদেশের আরেকটি অতি পুরনো মসজিদ। ষোলো শতকে নির্মিত নয় গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। বর্গাকার এই মসজিদের পরিমাপ বাইরের দিক থেকে ১৭.৮ মিটার এবং ভেতরের দিকে ১৩.৮ মিটার। প্রবেশপথগুলোর খিলান ছোটো মনে হয়, কারণ মসজিদটির মেঝে আশপাশের ভূমি থেকে প্রায় ০.৬ মিটার নিচু। এই মেঝের প্রায় ০.৭৬ মিটার নিচে ছিল এর আদি মেঝেটি। চুন-সুরকিতে তৈরি মসজিদটি নয়টি বাল্ব বা কন্দাকৃতির গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। বলা হয় যে, এটি এক রাতে নির্মিত। রাস্তা থেকে মসজিদের মেঝে প্রায় ২ ফুট নিচু বলে গল্প প্রচলিত যে, একরাতে মসজিদটি জেগে উঠছিল, সূর্য উঠে গেছে তাই সবটুকু উঠতে পারেনি। ভিত সেই অবস্থায় আজও নিচু রয়ে গেছে।

মথুরাপুর দেউলঃ মথুরাপুর দেউল ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার মথুরাপুর গ্রামে অবস্থিত একটি দেউল বা মঠ। এই প্রত্নতাত্ত্বিক অবকাঠামোটি আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীতে তৈরি করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়; তবে কারো কারো অনুমান এটি সপ্তদশ শতকের স্থাপনা। ইতিহাসকথিত আছে, সংগ্রাম সিং নামক বাংলার এক সেনাপতি এটি নির্মাণ করেছিলেন। দেউলটি মাটি থেকে প্রায় ২১.২ মিটার বা প্রায় ৭০ ফুট উঁচু; যার ভিতর একটি ছোটো কক্ষ রয়েছে। এর গঠন প্রকৃতি অনুসারে একে মন্দিরও বলা চলে। এটি একটি রেখা প্রকৃতির দেউল। বারো কোণবিশিষ্ট একটি ভবনের মতো স্থাপনা। এর দুটি প্রবেশ পথ আছে, একটি দক্ষিণমুখী অন্যটি পশ্চিমমুখী। বারোটি কোণ থাকায় উপর থেকে দেখলে এটিকে তারার মতো দেখা যায়। পুরো স্থাপনা জুড়ে টেরাকোটার জ্যামিতিক ও বাহারি চিত্রাঙ্কন রয়েছে। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনির চিত্র, গায়ক, নৃত্যকলা, বীর এবং যুদ্ধচিত্রও এই দেউলের গায়ে খচিত রয়েছে। এটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের একটি সুরক্ষিত সম্পদ।

কী বন্ধুরা,ফরিদপুর আসছো তো? আরো অনেক কিছু দেখতে পারবে জসীম উদদীনের গাঁয়ে এলে।

তথ্যসূত্র:

১. সাতৈর মসজিদ, উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ।
২. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, বাংলাদেশের মসজিদ, বাংলা

একাডেমি, এপ্রিল,১৯৮৭
৩. মো: আব্দুস সাত্তার, ফরিদপুরে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে,১৯৯৩
৪. আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশের জেলা পরিচিতি, বুক ওয়ার্ল্ড, এপ্রিল, ২০০৬
৫. শাহনাজ হুসনে জাহান, বাংলাপিডিয়া, শেষ সম্পাদনা, ১৯ মার্চ ২০১৫
৬. জাহিদ রিপন, দৈনিক যুগান্তর, ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৫, শেষপৃষ্ঠা।
৭. জহির হোসেন, ঢাকা পোস্ট, ফরিদপুর, ১১ মার্চ ২০২৬
৮. প্রত্যন্ত গ্রামে ৬০০ বছরের পুরানো মসজিদ, প্রথম আলো, ১৪ মার্চ ২০২৬
৯. জেলা গেজেটিয়ার ফরিদপুর।
১০. মো. সিরাজুল ইসলাম, গৌরবময় ঐতিহ্য: সুলতানী আমলের সাতৈর শাহী মসজিদ, ২০২৬ ❑

সহকারী শিক্ষক, এ বি এ উচ্চ বিদ্যালয়, ভাঙ্গা, ফরিদপুর

ভ্রমণ

আহসানুল হক

সারা বছর ব্যস্ত থাকি
ছুটি যদি জোটে
যাই ছুটে যাই দূর পাহাড়ে
কালক্ষেপণ নয় মোটে !

সমুদ্রও হাতছানি দেয়
সুনীল জলরাশি
দেশ-বিদেশে করতে ভ্রমণ
ভীষণ ভালোবাসি !

প্রাচীন কীর্তি, সভ্যতাও
ভীষণ আমায় টানে
ভ্রমণ শুধু জ্ঞান বাড়ায় না
সুখ-প্রশান্তি আনে !



নাইমুল ইসলাম, ষষ্ঠ শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কুমিল্লা

মো. তোফাজ্জল হোসেন তালুকদার

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত কুমিল্লা জেলা বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর একটি অঞ্চল। ইতিহাস, সংস্কৃতি, প্রত্নতত্ত্ব এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য সুপরিচিত। প্রাচীনকালে এই অঞ্চলটি ছিল সমতট জনপদের অংশ, যা বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনার মাধ্যমে আজও তার গৌরবময় অতীতের সাক্ষ্য বহন করছে। কুমিল্লার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান শুধু দেশের পর্যটকদেরই নয়, বিদেশি পর্যটকদেরও আকর্ষণ করে। ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের জন্য কুমিল্লা জেলার উল্লেখযোগ্য কিছু দর্শনীয় স্থানসমূহ তুলে ধরা হলো।

ময়নামতি শালবন বিহার: কুমিল্লার সবচেয়ে বিখ্যাত দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ময়নামতি শালবন বিহার। এটি মূলত একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার, যা সপ্তম শতকে নির্মিত হয়েছিল। এখানে খননের মাধ্যমে অসংখ্য প্রাচীন নিদর্শন, মূর্তি, মুদ্রা এবং পোড়ামাটির ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বিহারের চারপাশে সারিবদ্ধভাবে কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বসবাস করতেন। এটি ইতিহাসপ্রেমীদের জন্য এক অনন্য স্থান, কারণ এখানে এসে সহজেই প্রাচীন সভ্যতার ছোঁয়া অনুভব করা যায়।

ময়নামতি জাদুঘর: শালবন বিহারের কাছেই অবস্থিত ময়নামতি জাদুঘর। এই জাদুঘরে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে, যেমন- মূর্তি, অলংকার, মুদ্রা, মাটির পাত্র ইত্যাদি। যারা ইতিহাস জানতে



ভালোবাসেন, তাদের জন্য এই জাদুঘর একটি আদর্শ স্থান। এখানে প্রদর্শিত প্রতিটি বস্তুই অতীতের গল্প বলে এবং দর্শনার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (BARD): বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বা বার্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এটি শুধু





একটি প্রতিষ্ঠান নয়, বরং একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবেও পরিচিত। এর ভেতরের সুসজ্জিত বাগান, লেক এবং সবুজ পরিবেশ দর্শনার্থীদের মনকে প্রশান্ত করে। এখানে এসে অনেকেই প্রকৃতির মাঝে শান্ত সময় কাটাতে পারেন।

কোটিলা মুড়াঃ কোটিলা মুড়া ময়নামতির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। এটি মূলত তিনটি বৌদ্ধ স্তূপের সমন্বয়ে গঠিত। ধারণা করা হয়, এখানে বৌদ্ধধর্মের তিনটি প্রধান স্তম্ভ-বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘকে প্রতীকীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই স্থানের পরিবেশ খুবই শান্ত ও মনোরম, যা দর্শনার্থীদের মনে এক ধরনের প্রশান্তি এনে দেয়।

রানির বাংলোঃ রানির বাংলো একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা, যা এক সময় ব্রিটিশ আমলে ব্যবহৃত হতো। এটি একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত হওয়ায় এখান থেকে আশপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দরভাবে দেখা যায়। এই স্থানটি বর্তমানে পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

লালমাই পাহাড়ঃ লালমাই পাহাড় কুমিল্লার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটি অনন্য নিদর্শন। এটি খুব উঁচু না হলেও এর সবুজ পরিবেশ, শান্ত আবহাওয়া এবং সুন্দর দৃশ্য পর্যটকদের মুগ্ধ করে। অনেকেই এখানে পিকনিক করতে বা প্রকৃতির সান্নিধ্যে সময় কাটাতে আসেন।

চান্দিনা মসজিদঃ চান্দিনা মসজিদ কুমিল্লার একটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক মসজিদ। এর স্থাপত্যশৈলী অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। ধর্মীয় গুরুত্বের পাশাপাশি এটি একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন বহু মানুষ এখানে নামাজ আদায় করতে এবং এর সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসেন।

ইটাখোলা মুড়াঃ ইটাখোলা মুড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, যা ময়নামতি অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে খননের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাচীন স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এই স্থানটি প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে জানতে আগ্রহীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ধর্মসাগর দিঘিঃ কুমিল্লা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ধর্মসাগর দিঘি একটি বিশাল জলাশয়। এটি প্রাচীনকালে রাজা ধর্মপালের উদ্যোগে খনন করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। বর্তমানে এখানে



নৌকা ভ্রমণের ব্যবস্থা রয়েছে এবং সন্ধ্যায় এর চারপাশের আলোকসজ্জা মনোমুগ্ধকর পরিবেশ তৈরি করে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, কুমিল্লা জেলা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র। এখানে ইতিহাসের ছোঁয়া যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। বিশেষ করে ময়নামতির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো প্রমাণ করে যে, এই অঞ্চল এক সময় জ্ঞান ও সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। তাই সুযোগ পেলে একবার হলেও এই জেলার দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখা যায়। ❑

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক



দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ

চন্দনকৃষ্ণ পাল

দুটি চমৎকার শব্দ নিজের শরীরে ধারণ করে আছে যে স্থান তার নাম শ্রীমঙ্গল। শ্রী আর মঙ্গল এই শব্দ দুটি ছুঁয়ে থাকা শ্রীমঙ্গলে গিয়েছ তোমরা? না গেলে মা-বাবাকে বলে বছরের যে-কোনো সময় শ্রীমঙ্গল ঘুরে আসতে পারো। প্রতিটি ঋতুতেই আলাদা আলাদা সৌন্দর্যে সেজে ওঠে শ্রীমঙ্গল।

শ্রীমঙ্গলের অবস্থান সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলায়। শ্রীমঙ্গলের চা, লেবু, আনারস, রাবার বাগানের নৈসর্গিক সৌন্দর্য, বনজঙ্গল, প্রাকৃতিক হ্রদ, হাইল হাওরের বিচিত্র পাখি, মৎস সম্পদ, পাহাড় আর হাওরের মধ্যবর্তী সমতলে ফসলের সম্ভার সবাইকেই মুগ্ধ করে।

শ্রীমঙ্গলের প্রত্নসম্পদ ও ঐতিহ্যবাহী জনপদসমূহ তোমরা দেখে আসতে পারো। সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তোমাদের জন্য:

সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও: শ্রীমঙ্গলের একটি প্রাচীন জনপদ সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও। পাহাড় আর হাওরের মধ্যবর্তী সমতল ভূমি মিলেই সাতগাঁও-এর অবস্থান প্রখ্যাত চিকিৎসাশাস্ত্রের রচয়িতা চক্রপানি দত্তের পুত্র মহিপতি দত্ত যিনি চিত্রদত্ত নামে পরিচিত, তিনি ছিলেন এর অধিকারী।

মোতিগঞ্জ: শ্রীমঙ্গল এক সময় ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলার জনৈক মতিয়ার রহমান ত্রিপুরা রাজ্যের অংশ বিশেষ দখল করেন এবং নিজের নামে বিলাস নদীর তীরে মতিগঞ্জ বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। এই মতিগঞ্জ শ্রীমঙ্গল উপজেলার আদি প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থল ছিল। তৎকালীন সময়ে এটি একটি প্রসিদ্ধ এবং ব্যস্ত ব্যাবসা কেন্দ্র ও নদীবন্দর ছিল। কলকাতা থেকে মতিগঞ্জ পর্যন্ত জাহাজ চলাচল করত। ১৮৯৭

খ্রিষ্টাব্দের ১২ই জুলাই প্রবল ভূমিকম্পের ফলে বিলাস নদী নাব্যতা হারিয়ে ফেলে। ফলে মতিগঞ্জের সাথে নৌ যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। ইতোমধ্যে ১৯০২ সালে শ্রীমঙ্গল রেলস্টেশন (আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শ্রীমঙ্গলের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রাচীন দিঘিঃ শ্রীমঙ্গল উপজেলার প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ দিঘিগুলো মূল্যবান পুরাকীর্তি হিসেবে বিবেচিত। যেমন- ভূনবীরের দণ্ড খানের দিঘি, নির্মাই শিববাড়ির দিঘি, সিন্ধুরখাঁনের হর্মাই দিঘি, শ্রীমঙ্গলের সাগরদিঘি (সুরময়ী দিঘি), হিরা খাঁর দিঘি, চানখাঁর দিঘি প্রভৃতি।

চা-বাগান, বন ও পাহাড় শ্রেণিঃ চা সংসদ এর হিসাব অনুযায়ী, বৃহত্তর সিলেটে চা-বাগানের সংখ্যা ১৩৫। মৌলভীবাজার জেলার চা-বাগানের বেশিরভাগই শ্রীমঙ্গল উপজেলায়। শ্রীমঙ্গল শহরের প্রায় তিন দিকেই চা-বাগান, চা গাছের শ্রেণিবিন্যাস। রয়েছে ছায়া গাছের সারি। আধো আলো আধো ছায়ায় দিগন্ত বিস্তৃত চা-বাগান যেন প্রকৃতি প্রদত্ত এক সবুজ কার্পেট। চা-বাগানের ফাঁকে ফাঁকে ছোটো ছোটো ছড়া। ছড়ায় জলকলধ্বনি, ছায়া গাছে পাখির কলকাকলি, অপূর্ব নির্জনতা মানুষকে সৌন্দর্যের এক অপার দিগন্তে পৌঁছে দেয়। শ্রীমঙ্গলের পাহাড়ি এলাকায় রয়েছে খাসিয়া, টিপরা, গারো, উড়িয়াসহ নানা আদিবাসী ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর বাস। সমতলে বাঙালির পাশাপাশি নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে বাস করছে মনিপুরীরা। এসব আদিবাসী ও উপজাতিদের প্রত্যেকের রয়েছে গর্ব করার মতো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, আচার ও বৈচিত্র্যময় জীবনধারা। যা সহজেই পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

হাওর ও মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রাঃ হাইলহাওর শ্রীমঙ্গলের আর এক সৌন্দর্যের নাম। গোপলা নদী, ছোটো-বড়ো প্রায় ৬০টি বিল আর হাইলহাওরের জনপদে শত শত মৎস্যজীবীর বাস। পানিতে টইটুম্বর হয়ে যায় পুরো হাইলহাওর। এর তখন আর এক রূপ। শীতে পরিযায়ী পাখির ভিড়ে আর এক রূপধারণ করে শ্রীমঙ্গল। তখন শীতকালীন অতিথি পাখির রাজ্যে পরিণত হয়। এত কিছু জানার পর বন্ধুরা বলো তো কবে আসছ চায়ের দেশে? ❑

সম্পাদক, ছড়াপত্র

ভ্রমণের হাতছানি

বদরুল হক

হাতছানি দেয় দূরের পাহাড়
সবুজ সবুজ বন,
রূপের মেলায় বনের ছায়ায়
ছড়িয়ে দিলাম মন।

নীল সাগরের অথৈ জলে
উতল ঢেউয়ের গান,
বেলাভূমির স্নিগ্ধ হাওয়ায়
জুড়িয়ে নিলাম প্রাণ।

ঝরনাধারার শীতল জলে
ক্লান্তি করি দূর,
ঝিরিঝিরি জলের ধ্বনি
মন মাতানো সুর।

হাওর বিলে পাখির মেলা
হাজার ঝাঁকে ঝাঁক,
আজও শুনি মিষ্টি মধুর
কিচিরমিচির ডাক।

চোখ জুড়ানো প্রাণ ভুলানো
হরেক স্মৃতির রেশ,
ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে
নেইকো তারই শেষ।

চলো যাই সিলেটে

সাফায়েত কবীর

সিলেট বাংলাদেশের অন্যতম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, যা প্রকৃতিকন্যা নামে পরিচিত। পাহাড়, ঝরনা আর সবুজের প্রাচুর্যে ভরা সিলেট। প্রকৃতি যেন দুহাত খুলে সিলেটের সৌন্দর্য মেলে ধরে আছে যুগ যুগ ধরে। সিলেটের সীমান্তবর্তী উপজেলায় ছড়িয়ে আছে নানা পর্যটন কেন্দ্র। জল-পাহাড়ের নদী খ্যাত বিছানাকান্দি, পাথর রাজ্য ভোলাগঞ্জের সাদা পাথর, মিঠাপানির জলার বন রাতারগুল, লালাখাল ও জাফলং। চলো ঘুরে আসি সেসব পর্যটন কেন্দ্রে।

জাফলং: সিলেট নগরী থেকে ৬২ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব দিকে গোয়াইনঘাট উপজেলায় জাফলং এর অবস্থান। প্রকৃতি কন্যা হিসেবে সারা দেশে এক নামে পরিচিত সিলেটের জাফলং। খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত জাফলং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরুপ লীলাভূমি। পিয়াইন নদীর তীরে স্তরে স্তরে বিছানো পাথরের স্তূপ জাফলংকে করেছে আকর্ষণীয়। সীমান্তের ওপারে ইন্ডিয়ান পাহাড় টিলা, ডাউকি পাহাড় থেকে অবিরাম ধারায় প্রবাহমান জলপ্রপাত, ঝুলন্ত ডাউকি ব্রিজ, পিয়াইন নদীর স্বচ্ছ হিমেল পানি, উঁচু পাহাড়ে গহিন অরণ্য ও সুনসান নীরবতার কারণে এলাকাটি পর্যটকদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। ভ্রমণপিয়াসীদের কাছে জাফলং এর আকর্ষণই যেন আলাদা। বর্ষায় জাফলং এর রুপ লাবণ্য যেন ভিন্ন মাত্রায় ফুটে উঠে।

পান্থুমাই ঝরণা: পান্থুমাই ভারতের মেঘালয়ের সীমান্তবর্তী একটি গ্রামের নাম। এই গ্রামের নামেই পান্থুমাই ঝরণার নামকরণ। গ্রামটির অবস্থান সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার পশ্চিম জাফলংয়ে। শুধু ঝরণা নয়, এই গ্রামটিই বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর গ্রামগুলোর একটি। মেঘালয়ের পাহাড়, পিয়াইন নদী আর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে এই ঝরণা। পান্থুমাই ঝরণার অবস্থান মূলত ভারতে। সেখানে এটি বড়োহিল ঝরণা বা বোরহিল ঝরণা নামে পরিচিত। ভারতে হলেও নৌকা নিয়ে এই ঝরণার কাছাকাছি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত বাংলাদেশীরা যেতে পারে। পান্থুমাই ঝরনার সৌন্দর্য বর্ষায় পূর্ণতা পায়। পাহাড়ের গায়ে লেগে থাকে মেঘ আর পিয়াইন নদীতে টলটলে স্বচ্ছ জল। তাই এক কথায় বলা যায় জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত পান্থুমাই ঝরণা ভ্রমণের জন্য সবচেয়ে ভালো সময়।





রাতারগুল সোয়াম্প ফরেস্ট: রাতারগুল বাংলাদেশের একমাত্র সোয়াম্প ফরেস্ট। এটি সিলেট জেলা শহর থেকে প্রায় ২২ কিলোমিটার দূরে গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত। রাতারগুল বনটি প্রায় ৩০,৩২৫ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। এই বিস্তীর্ণ এলাকার ৫০৪ একর জায়গায় রয়েছে বন আর বাকি জায়গা ছোটো বড়ো জলাশয়ে পূর্ণ। তবে বর্ষায় পুরো এলাকাটিকে দেখতে একই রকম মনে হয়। 'সিলেটের সুন্দরবন' নামে খ্যাত রাতারগুল জলাবন বছরে চার থেকে পাঁচ মাস পানির নিচে তলিয়ে থাকে। তখন পানিতে ডুবে থাকা বনের গাছগুলো দেখতে সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পর্যটকরা এসে ভিড় জমায়। অনেক পর্যটক রাতারগুলকে 'বাংলাদেশের আমাজন' হিসেবে অভিহিত করেন। বর্ষায় গাছের ডালে দেখা মিলে নানান প্রজাতির পাখি, আবার তখন কিছু বন্যপ্রাণীও আশ্রয় নেয় গাছের ডালে। এছাড়া শীতকালে রাতারগুলের জলাশয়ে বসে হাজারো অতিথি পাখির মেলা। সাধারণত জুলাই থেকে অক্টোবর (বর্ষার শেষের দিকে) পর্যন্ত রাতারগুল ভ্রমণের উপযুক্ত সময়।

ক্বীন ব্রিজ: পৃথিবীতে দর্শনীয় স্থানের অভাব নেই কিন্তু ক্বীন ব্রিজের মতো ঐতিহাসিক জিনিস দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই ব্রিজটি সিলেট শহরের প্রবেশদ্বার। তিরিশের দশকের দিকে আসাম প্রদেশের গভর্নর মাইকেল ক্বীন সিলেট সফরে আসেন। তাঁর স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতেই এ ব্রিজটি নির্মাণ করা হয় এবং পরবর্তীতে ব্রিজটির নামকরণ হয় গভর্ণর মাইকেল ক্বীনের নামানুসারে। এই ব্রিজটির পাশেই রয়েছে বিখ্যাত আলি আমজাদের ঘড়ি। ঘড়িটিকে অনেকেই লন্ডনের বিখ্যাত বিগ বেনের সাথে তুলনা করে থাকেন।

হাসন রাজা মিউজিয়াম: সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত হাসন রাজা মিউজিয়াম লোকসংগীত সাধক হাসন রাজার স্মৃতিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। হাসন রাজার জন্ম ১৮৫৪; মৃত্যু ১৯২১ খ্রি.। সুনামগঞ্জ পৌরসভা এলাকার তেঘরিয়ায় সুরমা নদীর কূল ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে হাসন রাজার স্মৃতি বিজড়িত বাড়িটি। কালোত্তীর্ণ এ সাধকের ব্যবহৃত কুর্তা, খড়ম, তরবারি, পাগড়ি, ঢাল, থালা, বই ও নিজের হাতের লেখা কবিতা ও গানের পাণ্ডুলিপিসহ আরো অনেক কিছু রয়েছে এই মিউজিয়ামে।

বিছনাকান্দি: বিছনাকান্দি সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার রুস্তমপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। বিছনাকান্দি মূলত জাফলং ও ভোলাগঞ্জের মতোই একটি পাথর কোয়ারি। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের খাসিয়া পাহাড়ের অনেকগুলো ধাপ দুই পাশ থেকে এসে বিছনাকান্দিতে মিলিত হয়েছে।



সেইসাথে মেঘালয় পাহাড়ের খাঁজে থাকা সুউচ্চ ঝরণা বিছনাকান্দির প্রকৃতিকে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা। পর্যটকদের কাছে বিছানাকান্দির মূল আকর্ষণ হচ্ছে পাথরের উপর দিয়ে বয়ে চলা স্বচ্ছ জলধারা আর পাহাড়ে শুভ্র মেঘের উড়াউড়ি। প্রথম দেখায় মনে হবে এ যেন এক পাথরের বিছানা, আর স্বচ্ছ পানিতে গা এলিয়ে দিতেই যে মানসিক প্রশান্তি এই প্রশান্তি আপনাকে বিছানাকান্দি টেনে নিয়ে যাবে বারবার। এ যেন পাহাড়, নদী, ঝরণা আর পাথর মিলিয়ে প্রকৃতির মায়াজাল বিছিয়ে রেখেছে। বছরের যে-কোনো সময়ই বিছনাকান্দি ভ্রমণের

জন্যে উপযুক্ত। তবে বর্ষাকালে চারদিকে প্রচুর পানি প্রবাহ থাকায় এ সময় বিছানাকান্দির প্রকৃত সৌন্দর্য দেখতে পাওয়া যায়।

ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর : ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর সিলেট জেলার অন্যতম বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরিচিত। ভ্রমণপিপাসু মানুষদের জন্য এটি একটি আকর্ষণীয় স্থান। সিলেট জেলা থেকে প্রায়



৩৫ কিলোমিটার দূরে কোম্পানিগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বেষ্টিত ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর। এখানে প্রচুর পরিমাণে সাদা পাথর থাকায় এ স্থানটির নাম হয়ত সাদা পাথর রাখা হয়েছে। বিশাল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত সাদা পাথরের অদ্ভুত সৌন্দর্যে পর্যটকদের মন প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

হযরত শাহজালাল (রহ.) মাজারঃ সিলেটের আম্বরখানায় অবস্থিত হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ও দর্শনীয় স্থান। ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে ৩৬০ আউলিয়ার সাথে সিলেট বিজয়ের পর তিনি এই স্থানে আস্তানা স্থাপন করেন। এই মাজার কমপ্লেক্সে একটি প্রাচীন মসজিদ, পুকুর, গজার মাছ এবং কবুতর রয়েছে।

হযরত শাহ পরাণ (রাহ.) এর মাজারঃ হযরত শাহ পরান (রহ.)-এর মাজার সিলেট শহরের পূর্ব দিকে খাদিম নগর এলাকায় অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থস্থান।

বন্ধুরা, রূপ-সৌন্দর্য, সবুজ প্রকৃতি, ঝরনা দেখতে হলে একটু সময় করে ঘুরে আসো সিলেট থেকে। ❑

প্রাবন্ধিক

চা-বাগান

মোহাম্মদ রনি আহমেদ

সন্ধ্যা নামে চা-বাগানে,
মন ছুটে যায় সবুজের টানে
আকাশ জুড়ে সোনালি আলো,
সবুজের মাঝে মন হয় ভালো।

চা-বাগানের ঢালু পথে
সবুজ গালিচা মাটির পাশে।
শ্রমিকদের গান বাজে ধীরে,
দিন কাটে শান্তির নীড়ে।

দূরের পাহাড় মেঘে ঢাকা,
মনে ঘুরে সুখের চাকা।
চায়ের কাপে গরম সুখ,
ভ্রমণে ভুলিয়ে দেয় সকল দুখ।

ভ্রমণ শেখায় শান্তির গান,
প্রকৃতির মাঝে জীবনের মান।
ভ্রমণের পথে ডাকে প্রাণ,
সবুজ ঢেউ চা-বাগান।

অষ্টম শ্রেণি, নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা





স্মৃতির পাতায় সিলেট

মাহমুদা দিনা

আমি তখন ছোটো। বয়স দশ কি এগারো বছর হবে। আমার বাবা-মা একদিন প্ল্যান করেন পরিবারের সবাইকে নিয়ে সিলেটে ঘুরতে যাবেন। বাবা-মায়ের সাথে আমরা তিন ভাইবোন আর নানা, নানিসহ- মোট সাতজন মিলে সিলেট হযরত শাহজালাল (রহ.) -এর মাজারের উদ্দেশ্যে রওনা করি। ময়মনসিংহ স্টেশন থেকে সকাল ৬টার ট্রেনে রওনা দিই। ঢাকার স্টেশনে ট্রেন থামলে আমরা সবাই মিলে নাশতা করি। আম্মু নাশতা বানিয়ে সঙ্গে নিয়েছিলেন। কারণ আমরা কেউ সকালে নাশতা করে বের হইনি।

ট্রেন ১৫ মিনিটের বিরতি শেষ করে আবার চলতে শুরু করল আপন গতিতে। আর থামল না। একেবারে পরের দিন সকালে সিলেট স্টেশন গিয়ে থামল। আমরা তিন ভাইবোন ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ কানে আওয়াজ এল আম্মু সবাইকে ডাকছেন- 'উঠ, আমরা চলে এসেছি! ট্রেন থেকে নেমে আবার সিএনজি ভাড়া করে শাহজালাল (রহ.) -এর মাজারের সামনে গিয়ে নামলাম। গাড়ি থেকে নেমেই তো অবাক! এত কবুতর একসাথে আমি আর কখনো দেখিনি।

সেখান থেকে হাতের ডানে একটা পুকুর। আব্বু, ভাই আর নানা হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মাজার জিয়ারত করলেন। কাছেই নারীদের নামাজের ব্যবস্থা আছে। আমরা সেখানে গিয়ে নামাজ আদায় করলাম। পরে সবাই একসাথে বের হয়ে চারদিকটা ঘুরে দেখতে লাগলাম। মাজারের অদূরেই একটা

পুকুরে মাছ চাষ করা হয়। মাছগুলো বেশ বড়ো বড়ো। আমরা মাছ দেখতে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। ওখানে পাশেই মাছের খাবার বিক্রি হচ্ছে। আব্বু সেখান থেকে খাবার কিনে আমাদেরকে বললেন, পুকুরের মাছ শুধু দেখলেই হবে, খাবার দিতে হবে না? আমরা বললাম, খাবার কই পাবো! আব্বু মাছের খাবারের প্যাকেটটা বের করে বললেন- এই নাও, তাদের খাবার।

আমরা মাছগুলোকে খুশি মনে খাবার খাওয়াতে লাগলাম। পানিতে খাবার ছিটিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে ফিনিশ! দীর্ঘক্ষণ মাছ দেখার পর আমরা দুপুরের খাবারের জন্য হোটেলে গেলাম। খাওয়া শেষ করে চারদিকের দোকানগুলো ঘুরে দেখছিলাম। এমন সময় এক দোকানে একটা ঘর সাজানোর ঝাড় চোখে পড়ল, নানুকে দেখালাম, ঝাড়টা নানুরও খুব পছন্দ হয়েছে। উনি নানার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ঝাড়টা কিনলেন। এদিকে আব্বুও আমাদের পছন্দমতো অনেক কিছু কিনলেন। আমরা আরো কিছুক্ষণ আশপাশে ঘোরাফেরা করে এসে আসরের নামাজ আদায় করলাম। এরপর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা করলাম।

রেল স্টেশনে এসে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি। মাগরিবের সময় ট্রেন এল। আমরা ট্রেনে উঠলাম। ট্রেনে আমার এক আঙ্কেলের সাথে দেখা। তিনি জোড়াজুড়ি করে আমাদেরকে তাদের বাসায় নিয়ে গেলেন। রাত সেখানেই কাটল। ভোরে ৫টার ট্রেনে আবার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা করলাম। ঢাকা স্টেশনে পৌঁছে ট্রেন ১৫ মিনিটের জন্য থামল। আব্বু সবার জন্য সকালের নাশতা কিনে আনলেন। আমরা নাশতা করলাম। ট্রেন আবার নিজ গতিতে চলতে শুরু করল ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে।

রাত ১০টায় এসে ট্রেন থামল ময়মনসিংহ স্টেশনে। আমরা একে একে নেমে আবার বেবিট্যাক্সিতে চড়ে বাসার দিকে রওনা করলাম। রাত সাড়ে দশটার দিকে বাসায় পৌঁছালাম। আনন্দময় এই সিলেট ভ্রমণের স্মৃতি আজও আমার হৃদয়ে গেঁথে আছে। ❑

প্রাবন্ধিক

ঘুরে ফিরে ঘরে আসি

গাজী আবদুস সালাম

শালনার যেই পাশে গরানের সারি
ঠিক তার নিকটেই আমাদের বাড়ি
গোলের পাতায় ঘেরা ছোটো এক ঘর
চাঁদের আলো ঝরে ঘরের উপর।

মাঝে মাঝে আচমকা ঘরটাকে ছাড়ি
ঘাস ভরা মেঠোপথ দিতে থাকি পাড়ি
এই পথের শেষ কোথা তা জানি না
চারপাশে দেখি যা লাগে অচেনা।

পথের পাশেই পড়ে বড়ো বনানি
সেই বনে কত গাছ কতটুকু জানি?
তারপর দেখা মেলে ছোটো এক নদী
সেইখানে মাঝি থাকে সাঁঝ অবধি।

সেই মাঝি কারো থেকে নেয় না টাকা
মুখ তার থাকে সদা হাসিতে মাখা
সন্ধ্যাটা ধীরে ধীরে নামে যেই গাঁয়
ভয় লাগে শিয়ালের হুক্কা হুয়ায়।

হঠাৎ মনে পড়ে ঘরে আমার মা
তাঁর যে ভালোবাসা নেই সীমানা
তখনই ফিরি আমি আপন ঘরে
এসে দেখি মা আমার দাঁড়িয়ে দোরে।





একদিনের ভ্রমণ

আশিকুর রহমান চৌধুরী

বাংলাদেশের প্রায় সবখানেই ছড়িয়ে আছে অসংখ্য দর্শনীয় স্থান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন আছে আমাদের দেশে তেমন আছে ইতিহাস ঐতিহ্যে সুন্দর সুন্দর স্থাপনা। জমিদার বাড়ি, জমিদারি আমলের মসজিদ, বিভিন্ন স্থাপনা ও দিঘি এই ঐতিহাসিক স্থানগুলো দৃষ্টিনন্দন ও দর্শনীয়। একেক জমিদারের শৌখিনতা ফুটে উঠতো তাদের কারুকার্যপূর্ণ রাজবাড়িতে। বহু বছর কেটে গেলেও এসব জমিদার বাড়ি আজও মাথা উঁচু করে সগৌরবে দণ্ডায়মান। কালের সাক্ষী হয়ে আজও সবার কৌতূহলের তৃষ্ণা মেটাচ্ছে। কোনো এক ছুটির দিনে স্বপরিবারে বেড়িয়ে আসতে পারো এই চমৎকার জায়গাগুলো থেকে। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে।

শ্যামসিদ্ধির মঠঃ প্রাকৃতিক পরিবেশের বেষ্টনীতে শ্যামসিদ্ধির মঠটি লিভার্টি অব স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছে ঐতিহ্যবাহী মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুরের শ্রীনগর থানার শ্যামসিদ্ধি গ্রামে। ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান শম্ভুনাথ মজুমদার তার স্বর্গগত পিতার স্বপ্নাদেশ পেয়ে ১৭৫৮ইং বাংলা ১২৪৩ বঙ্গাব্দে মঠটি নির্মাণ করেন। লাল ইটের তৈরি সুউচ্চ মঠটি বাহিরের দিক থেকে দেখতে ঠিক অষ্টাভূজাকার। মঠের সমুন্নত চূড়ার ওপর ছিল একটি কলস ও ত্রিশূল। কলসটি ভেঙে গেছে কিন্তু লোহার ত্রিশূলটি এখনো আছে কালের স্বাক্ষী হয়ে। মঠটির উচ্চতা প্রায় ২৪০-২৪২ ফুট। প্রত্যেক দিকের বর্গাকার ভূমির দৈর্ঘ্য ২১ ফুট। মঠের ভিতরে ক্ষেত্রফল ৩২৪ বর্গফুট এবং প্রবেশদ্বারের উচ্চতা ২৭ ফুট। অষ্টাভূজাকার দেয়ালের প্রত্যেকটিতেই জানালার মতো প্যানেল আছে সেগুলো খোলা যায় না। মঠটির উচুঁ শিখরটির চারপাশে ঘিরে থাকা অনেক ছিদ্র দেখতে পাবে, যার মধ্যে বাসা বেঁধেছে অজস্র পাখি, সন্ধ্যায় ঝাঁক বেঁধে ফিরে আসে নীড়ে। শ্যামসিদ্ধির মঠটি শুধু বিক্রমপুরের নয়, সারা বাংলাদেশের নয়–সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ঐতিহ্যবাহী মঠ।

ভাগ্যকুল জমিদার বাড়িঃ ভাগ্যকুলের জমিদারদের অনেকগুলো বাড়ির মধ্যে একমাত্র টিকে থাকা বাড়িটি বান্দুরায় অবস্থিত। ভাগ্যকুলের এই জমিদার বাড়িটি বানিয়েছিলেন জমিদার যদুনাথ সাহা।দ্বিতল বাড়ির সামনে রয়েছে আটটি বিশাল থাম। বাড়িটি গ্রিক স্থাপত্যের ঘরনায় নির্মিত। ভবনের ভেতরে সাপ, ময়ূর, ফুল, পাখি সহ নানান নকশা রয়েছে। এর দরজা এবং জানালা একই উচ্চতার। একতলা থেকে দোতলায় যাওয়ার সিঁড়িটি কাঠের তৈরি। এ বাড়ির সামনে গদিঘর ছিল। আনুমানিক ১৯২০ সালের আগে বা পড়ে নির্মাণ করা হয়।

ইদ্রাকপুর কেল্লা: মুন্সিগঞ্জ শহরের প্রাণ কেন্দ্রে ইদ্রাকপুর কেল্লা অবস্থিত। মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে সেনাপতি ও বাংলার সুবেদার মীর জুমলা ১৬৬০ সালে এই দূর্গটি নির্মাণ করেন। মগ জলদস্যু ও পর্তুগীজদের আক্রমণ থেকে এলাকাকে রক্ষা করার জন্য দূর্গটি নির্মিত হয়। সুউচ্চ প্রাচীরবিশিষ্ট এই দুর্গের প্রত্যেক কোনায় রয়েছে একটি বৃত্তাকার বেষ্টনী। দুর্গের ভেতর থেকে শত্রুর প্রতি গোলা নিক্ষেপের জন্য প্রাচীরের মধ্যে অসংখ্য চতুষ্কোনাকার ফোঁকর রয়েছে। একমাত্র খিলানাকার দরজাটির অবস্থান উত্তর দিকে। মূল প্রাচীরের পূর্ব দেয়ালের মাঝামাঝি অংশে ৩৩ মিটার ব্যাসের একটি গোলাকার উঁচু মঞ্চ রয়েছে। দূর থেকে শত্রুর চলাচল পর্যবেক্ষণের জন্য প্রায় প্রতি দুর্গে এই ব্যবস্থা ছিল। কেল্লাটির তিন কিলোমিটারের মধ্যেই ইছামতী, ধলেশ্বরী, মেঘনা এবং শীতলক্ষা নদীর অবস্থান। মোঘল স্থাপত্যের একটি অনন্য কীর্তি হিসেবে ইদ্রাকপুর দুর্গটি ১৯০৯ সালে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষিত হয়।

অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান: অতীশ দীপঙ্কর ৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে বিক্রমপুর পরগণার বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এটি বর্তমানে বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত। অতীশ দীপঙ্কর গৌড়ীয় রাজ পরিবারে রাজা কল্যাণশ্রী ও প্রভাবতী দেবীর মেজ সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছোটোবেলায় তাঁর নাম ছিল আদিনাথ চন্দ্রগর্ভ। ১২বছর বয়সে নালন্দায় আচার্য বোধিভদ্র তাঁকে শ্রমণ রূপে দীক্ষা দেন এবং তখন থেকে তাঁর নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি পশ্চিম ভারতের কৃষ্ণগিরি বিহারে গমন করেন এবং সেখানে প্রখ্যাত পণ্ডিত রাহুল গুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক গুহ্যাবিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করে 'গুহ্যজ্ঞানবজ্র' উপাধিতে ভূষিত হন।দীপঙ্কর ১০১১ খ্রিষ্টাব্দে শতাধিক শিষ্যসহ মালয়দেশের সুবর্ণদ্বীপে (বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপ) গমন করেন এবং আচার্য ধর্মপালের কাছে দীর্ঘ ১২ বছর বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অধ্যয়ন করে স্বদেশে ফিরে আসেন। এরপর তিনি বিক্রমশীলা বিহারে অধ্যাপনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

সোনারং জোড়া মঠ: অষ্টাদশ শতাব্দীর স্থাপত্যশৈলীর এক অপূর্ব প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন এ মঠ। মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গিবাড়ী উপজেলার মঠটি ইতিহাসে জোড়া মঠ হিসেবে পরিচিত লাভ করলেও মূলত এ দুটি জোড়া মন্দির। বড়টি কালী মন্দির (উচ্চতা ১৫ মিটার) আর ছোটটি শিবমন্দির। বড়োটি পশ্চিম পাশে এবং ছোটটি পূর্ব পাশে অবস্থিত। রূপচন্দ্র নামের এক হিন্দু বণিক তার বাবার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৮৪৩ সালে বড়োটি আর ছোটটি নির্মাণ করেন ১৮৮৬ সালে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে।চুন-সুড়কি আর ইট দিয়ে তৈরি মন্দিরের দুটি বারান্দা যথাক্রমে ১.৯৪ ও ১.৫ মিটার।

আতিয়া জামে মসজিদ: টাঙ্গাইল সদর থেকে ৬ কিলোমিটার দক্ষিণে দেলদুয়ার উপজেলার আতিয়া গ্রামে মসজিদটি বাংলাদেশের পুরনো দশ টাকার নোটে রয়েছে। এ কারণে আতিয়া জামে মসজিদ সবার কাছেই মোটামুটি পরিচিত। প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, আতিয়া মসজিদের নির্মাণশৈলীতে সুলতানি ও মোগল উভয় আমলের বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট নির্দশন রয়েছে। কিবলা দেয়ালে তিনটি অলংকৃত মিহরাব রয়েছে। চুন, সুরকির গাঁথুনি দিয়ে নির্মিত মসজিদটির দেয়ালে রয়েছে টেরাকোটার কারুকাজ। দৈর্ঘ্য ১৮.২৯ মিটার , প্রস্থ ১২.১৯ মিটার, দেয়ালের পুরুত্ব ২.২৩ মিটার। চারকোনা অষ্টকোনাকৃতি মিনার রয়েছে। মসজিদটিতে একটি আরবি ও একটি ফারসি ভাষার শিলালিপি আছে। এই লিপিগুলো থেকে জানা যায় ৪১৭ বছরের পুরনো মসজিদ এটি।

মহেরা জমিদার বাড়ি: টাঙ্গাইল শহর থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত এই জমিদার বাড়ি। ১৮৯০ সালেরও আগে স্পেনের করডোভা নগরের আদলে নির্মিত। কালীচরণ সাহা ও আনন্দ সাহা নামে দুই ভাই ১ হাজার ১৭৪ শতাংশ জমির উপর এই বাড়ি নির্মাণ করেন। এই বাড়িতে ঢুকতেই চোখে পড়বে বিশাখা পুকুর। ভেতরে ঢুকলে আনন্দ লজ, মহারাজ লজ, কোলীচরণ লজ নামে অনেক সুন্দর সুন্দর ভবন আছে। ইংরেজি ইউ অক্ষরের আদলে করা ভবনটি রানিদের জন্য নির্মাণ করা হয়। তাই একে রানি ভবনও বলা হতো। সব মিলিয়ে স্বপ্নপুরীর মতো মনে হবে মহেরা জমিদার বাড়ি।

হেমনগর জমিদার বাড়িঃ জমিদার হেমচন্দ্রের নামেই স্থানটির নামকরণ হয় হেমনগর। ১৮৯০ সালের দিকে হেমচন্দ্র এখানে তার এই সুন্দর রাজকীয় বাড়িটি নির্মাণ করেন ১৮০০ বিঘার উপরে। জানা যায়, দিল্লি ও কলকাতার কারিগররা এই বিশাল জমিদার বাড়ি নির্মাণ করেন। স্থানীয়রা এই বাড়িকে পরীর দালান নামেই বেশি চেনেন। বাড়ির পিলারগুলোতেও কারুকার্য করা। মেঝেতেও অপূর্ব নকশা করা, বাড়িটিতে আছে ২৫টি কক্ষ।

করটিয়া জমিদার বাড়িঃ মোগল স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম নিদর্শন হলো করটিয়া জমিদার বাড়ি। করটিয়া ইউনিয়নের পুটিয়া নদীর তীরে এই জমিদার বাড়ি অবস্থিত। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় এই বাড়ির জমিদার ভারতে চলে যান। তবে এখন তার কিছু বংশধরেরা বাস করছে বাড়িটিতে।

দেলদুয়ার জমিদার বাড়িঃ টাঙ্গাইলের একমাত্র মুসলিম জমিদার বাড়ি হচ্ছে দেলদুয়ার জমিদার বাড়ি। স্থানীয়দের কাছে এটি নর্থহাউজ নামেও পরিচিত। ঔপনিবেশিক স্থাপত্যশৈলীর আদলে তৈরি লাল-সাদা রঙের একতলা এই জমিদার বাড়ির শিল্পকর্মে মসজিদের মতো কারুকার্য দেখা যায়। জমিদার বাড়ির ঠিক পূর্ব পাশে আছে লোহার গার্ডেন চেয়ার, গোল টেবিল, পানির ফোয়ারা। পেছনে আছে আম বাগান। পূর্ব-দক্ষিণ কোণে রয়েছে তিনটি বিশাল গম্বুজ-বিশিষ্ট মসজিদ।

পাকুটিয়া জমিদার বাড়ি : টাঙ্গাইল সদর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণে নাগরপুর উপজেলার লৌহজং নদীর তীরে রয়েছে পাকুটিয়া জমিদার বাড়ি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে রামকৃষ্ণ সাহা মন্ডল নামের একজন ধর্নাঢ্য ব্যক্তি ১৫ একর জায়গার ওপর ৩টি অট্টালিকা নির্মাণ করেন। এগুলোর একত্রে নাম রাখেন তিন তরখ। রেলিং টপ কিংবা কার্নিশ যে দিকেই চোখ যাবে দেখা যাবে ছোটো ছোটো মূর্তি। তার পাশে আছে ময়ূরের ভাস্কর্য। ১০০ বছরের পুরনো ছায়াঘেরা পরিবেশ জমিদারদের আমেজটা আজও ধরে রেখেছে বাড়িটি। বাড়ির পেছনে আছে একটি দিঘি ও ২টি পরিত্যক্ত কূপ। ❑

প্রাবন্ধিক

সোনারগাঁয়ের স্মৃতি

টিটু মালাকার

পুরনো পথ ইতিহাসে ভরপুর
মসলিন কাপড়ের স্মৃতিবিধুর
প্রাচীন বাড়ি নীরব দাঁড়ায়
অতীত যেন গল্প গড়ায়।

ইটের দেয়াল বলে কথা
ইতিহাসের গোপন ব্যথা
মিউজিয়ামের নীরব ঘরে
সময়ের গল্প ধরা পড়ে।

পাখির ডাকে সকাল নামে
পুরনো স্মৃতি জেগে থাকে
দূরের পথ বলে গান
ইতিহাসে ভরে প্রাণ।

সন্ধ্যার আলো পড়ে ধীরে
স্বপ্নেরা হাঁটে সময় ঘিরে
নীরবতায় ভাসে দিন
অতীত যেন সোনালি ঋণ।

সোনারগাঁও শেখায় মান
ইতিহাসে মানুষের প্রাণ
ভ্রমণ পথে ডাকে তাই
অতীত সুখে ভেসে যাই।



ঢাকার কিছু দর্শনীয় স্থান

মাহমুদা কামাল

ঢাকা একটি বিশাল ও ব্যস্ত শহর, যেখানে বেড়ানোর মতো অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে। ঢাকায় ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বেশ কিছু স্থান রয়েছে যেখানে খুব সহজে যাওয়া যায়।

জাতীয় জাদুঘরঃ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে অবস্থিত একটি জাদুঘর। এটি ২০শে মার্চ ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৭ই আগস্ট ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে এর আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করা হয়। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ১৭ই নভেম্বর এটিকে জাতীয় জাদুঘরের মর্যাদা দেওয়া হয়। এ দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, এবং ইতিহাস সংরক্ষণের প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে জাতীয় জাদুঘর। শাহবাগ মোড়ের পাশে জাদুঘরটি একটি বিশাল ভবনে অবস্থিত যা সুন্দরভাবে সাজানো এবং বিভিন্ন প্রদর্শনী কক্ষ দিয়ে বিভক্ত। এখানে প্রাচীন সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন, প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার এবং প্রাগৈতিহাসিক কালের বিভিন্ন উপকরণ প্রদর্শিত আছে।



এছাড়া এখানে নৃতত্ত্ব, চারুকলা, ইহিহাস, প্রকৃতি এবং আধুনিক ও প্রাচীন সভ্যতা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে আলাদা ৪৫টি গ্যালারি রয়েছে। এছাড়া এখানে একটি সংরক্ষণাগার এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনালয় আছে। জাদুঘরে রয়েছে প্রায় ৮০,০০০টির বেশি সংগ্রহ, যার মধ্যে রয়েছে প্রাচীন মুদ্রা, পাণ্ডুলিপি, অস্ত্র, পোশাক, গহনা, এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। জাতীয় জাদুঘরের স্থাপনার নকশা করেছেন স্থপতি সৈয়দ মাইনুল হোসেন।

লালবাগ কেল্লাঃ রাজধানী ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে পুরান ঢাকার লালবাগ এলাকায় লালবাগ কেল্লা দাঁড়িয়ে আছে ৪০০ বছর ধরে। ঢাল তলোয়ার নিয়ে সৈন্যরা একসময় পাহারা দিত এখানে। ঢাকাকে বহিঃশত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল এই দুর্গ।

লালবাগ কেল্লা ১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ করেছিলেন আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা আজম শাহ্। মুঘল আমলে এটি ছিল পূর্ব বাংলার রাজধানী। একসময় লালবাগ কেল্লায় ৫০০ সেনার সমাগম ছিল। বড়ো কাটারা থেকে সেনাদের রসদ সরবরাহ করা হতো। বর্তমানে প্রতিদিন দেশি বিদেশি পর্যটকে মুখরিত হয়ে ওঠে লালবাগ কেল্লা।

মুঘল আমলে নির্মিত সুরক্ষিত একটি দুর্গ হচ্ছে লালবাগ কেল্লা। লাল ইট, মার্বেল পাথর এবং কষ্টি পাথর দিয়ে নির্মিত এই কেল্লা যেমন দামি, তেমনি সমৃদ্ধ বাংলার ঐতিহ্য বহন করে। বুড়িগঙ্গা নদীর কোল ঘেঁষে ছিল লালবাগ কেল্লার প্রাচীর। তবে বুড়িগঙ্গা এখন অনেকটা দূরে চলে গেছে।

বাংলার প্রাদেশিক গভর্নর বা সুবেদার নির্বাচিত হওয়ার আগে শায়েস্তা খান ছিলেন তখনকার প্রধান সেনাপতি ও শাহজাদা আজমের আত্মীয়। পরিবিবি ছিলেন শায়েস্তা খানের কন্যা।

মুঘল আমলের সম্রাটদের মুল বাসস্থান ছিল বড়ো কাটারায়। আর ছোটো কাটারা ছিল মূলত গেস্ট হাউস। বাইরে থেকে অতিথি এলে ছোটো কাটারায় আপ্যায়ন করা হতো।

দরবার হলের দ্বিতীয় তলায় বিচার কার্য সম্পাদন করা হতো। নিচতলায় আছে একটি সুড়ঙ্গ পথ। এই সুড়ঙ্গ পথ ধরে যাওয়া যেত নদীর ঘাটে।

পুরান ঢাকায় অবস্থিত সপ্তদশ শতাব্দীর মোঘল নিদর্শন লালবাগ কেল্লায় প্রধানত তিনটি স্থাপনা রয়েছে: পরীবিবির মাজার, তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ এবং দরবার হল ও হাম্মামখানা । এছাড়া বিশাল এলাকা জুড়ে বাগান, পানির ফোয়ারা, একটি জাদুঘর এবং কষ্টি পাথর ও মার্বেল পাথরের নান্দনিক কারুকাজ এখানে দেখার মতো।

আহসান মাঞ্জিলঃ রাজধানীর পুরান ঢাকার বুড়িগঙ্গার তীরবর্তী ইসলামপুরের কুমারটুলী এলাকায় মাথা উঁচু করে স্বগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে তৎকালীন নবাবদের তৈরি দেড়শো বছরের পুরোনো আহসান মঞ্জিল। শেখ এনায়েত উল্লাহর তৈরি প্রমোদভবনটি বর্তমানে জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৮৫৯ সালে নওয়াব আব্দুল গনি এটির নির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং ১৮৭২ সালে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। প্রাণপ্রিয় পুত্র খাজা আহসান উল্লাহর নামে এর নামকরণ করা হয় আহসান মঞ্জিল।



উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে প্রায় ১০০ বছর পর্যন্ত এই প্রাসাদটি বাংলার একটি প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল। ২৩ টি গ্যালারি নিয়ে ১৯৯২ সালে দর্শনীয় স্থানটি পুনরায় সংস্কারের মাধ্যমে জাদুঘরে (আহসান মঞ্জিল জাদুঘর) রূপান্তর করে দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

আহসান মঞ্জিল দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথমভাগে মূল ভবন এবং অন্যটি অন্দরমহল যা দুতলা বিশিষ্ট। মূল ভবনের নিচতলায় ১০ টি রুম এবং উপরের তলায় ১৪ টি রুম রয়েছে। নিচ তলার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর সৈনিকদের বর্ম, নবাবদের ব্যবহৃত ধাতব, পিতল, সিরামিক এবং চীনামাটির তৈরি নানা ধরনের আসবাবপত্র, ফলপাত্র, আতরদান; বক্ষণাস্ত্র, শিরণাস্ত্র, দাঁতসহ হাতির মাথার কঙ্কাল, বিলিয়ার্ড টেবিল, বক্স, ভল্ট সহ দৈত্যাকার আলমারি ও সিন্ধুক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

দোতলায় রয়েছে মাওলানা আকরাম খাঁ, এ কে ফজলুল, হরপ্রসাধ শাস্ত্রী, বিপিন চন্দ্র পাল, সৈয়দ আমীর আলী, হাজী মুহাম্মদ মহসিন, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বেগম রোকেয়া, কাজী নজরুল ইসলাম, হাছন রাজা, জগদীশ চন্দ্র বসু প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের প্রতিকৃতি। এছাড়াও রয়েছে নবাবদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র। আহসান মঞ্জিলকে ঢাকা শহরের প্রথম ইট-পাথরের তৈরি স্থাপত্য নিদর্শন মনে করা হয়। একসময় ঢাকা শহরের সবচেয়ে উঁচু গম্বুজ ছিল আহসান মঞ্জিলের প্রাসাদের ছাদের ওপরের সুন্দর গম্বুজটি।

লাল কুঠিঃ ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ওয়াইজঘাটে অবস্থিত 'লালকুঠি' (নর্থব্রুক হল) ১৮৭৪ সালে নির্মিত একটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্থাপনা। ব্রিটিশ গভর্নর লর্ড নর্থব্রুকের সম্মানে এটি নির্মিত হয়, যা লাল রঙের কারণে স্থানীয়দের কাছে লালকুঠি নামে পরিচিত। এটি স্থাপত্যিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত এবং বর্তমানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধীনে সংস্কারাধীন ।

পুরান ঢাকার কাজীবাড়িঃ পুরান ঢাকার কলতাবাজারে অবস্থিত প্রায় ২০০ বছরের পুরনো 'কাজী বাড়ি' মূলত একটি ঐতিহ্যবাহী স্থান, যা বর্তমানে হেরিটেজ হোম ট্যুর এবং খাবারের জন্য পরিচিত। ১৮২০ সালে মীর এলাহী বক্স কর্তৃক নির্মিত এই বাড়িটি প্রাচীন স্থাপত্যশৈলীর এক অনন্য নিদর্শন। এখানে দর্শনার্থীদের জন্য পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে। ৬ থেকে ১০ জনের দলের জন্য এখানে হেরিটেজ হোম ট্যুর বা ভ্রমণের সুযোগ রয়েছে। কাজীবাড়ির ইতিহাস প্রায় ৫০০ বছরের পুরোনো। আর ১৮২০ সালে বর্তমান বাড়িটি তৈরি করেন কাজী মির্জা এলাহি বক্স। তিনি সাদের পঞ্চম পুরুষ। ১৮৯২ সালে শহর কাজী নিযুক্ত হন কাজী আব্দুর রউফ। সেই থেকে বাড়িটির নাম হয়ে যায় কাজীবাড়ি।



কাজী বাড়িতে প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে শত বছরের পুরনো ট্রাঙ্ক, সিন্দুক, বাক্স, মোমবাতি, গ্রামোফোন, এবং পুরনো দিনের আসবাবপত্র ও শোকেস। এছাড়া এখানে এখনো ঘোড়ার গাড়ির রাস্তা, বাগানে প্রবেশের ফটক, লাঠিয়ালদের ঘর এবং অন্দর মহলের দৃশ্যও বিদ্যমান। ❑

প্রাবন্ধিক

পাহাড়ের দেশে

নাফিসা তাসনিম স্নেহা

আমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। নানুর বাড়ি আমাদের বাড়ির খুব কাছেই। প্রতি বছর পরীক্ষার পর আমার খালামনি নানুর বাড়িতে বেড়াতে আসেন। এবারও তিনি এসেছিলেন। আমার যেহেতু পরীক্ষা শেষ, তাই খালামনিরা যখন তাদের বাড়ি ফিরছিলেন, আমিও তাদের সাথে বেড়াতে গেলাম।

খালামনির বাড়ি নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার রংছাতি গ্রামে। তিনি একটি স্কুলের শিক্ষিকা। একদিন আমি তাঁর সাথে স্কুলে গিয়ে ছোটো ছোটো শিক্ষার্থীদের পড়াতে তাঁকে সাহায্য করি। তাদের পড়াতে আমার খুব ভালো লেগেছিল।

খালামনির বাড়ির পাশে একটি বড়ো মাঠ ছিল। আমি আর আমার খালাত বোন প্রতিদিন মাঠে খেলতে যেতাম। সারাদিন ঘুরে বেড়াতাম, আর রাতে সবাই মিলে গল্প করতাম। এভাবেই খুব আনন্দে কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো।

একদিন হঠাৎ মামামনি (আমার খালাত বোনের বাবা) আমাদের বললেন, 'তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে তৈরি হও, আজ তোমাদের নিয়ে ঘুরতে যাব!' আমরা দ্রুত তৈরি হয়ে মোটরসাইকেলে চড়ে তিনটি সুন্দর জায়গায় গিয়েছিলাম।

প্রথমে গেলাম পাহাড়ের উপর ছোটো একটি গ্রামে, নাম চন্দ্রডিঙা। সেখানে গারো জনগোষ্ঠীর মানুষদের সাথে কথা বললাম এবং কাছের একটি ঝরনা দেখলাম।

এরপর আমরা গেলাম পাহাড়ের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি নদীর কাছে। তখন বৃষ্টি না থাকায় নদীতে পানি কম ছিল। তবুও নদীতে নামলাম।

শেষে আমরা গেলাম মহিশখলা নামের একটি জায়গায়। এটি সমতল হলেও পাহাড়ের একদম কাছে। সেখান থেকে পাহাড়গুলো খুব সুন্দর দেখা যায়। শুনলাম, মাঝে মাঝে নাকি পাহাড় থেকে হাতি নেমে আসে! তাই বিজিবি আমাদের সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে দেয়নি।

তারপর মামামণি পাঁচগাঁও সীমান্ত বাজার থেকে আমাদের চকলেট কিনে দিলেন।

অবশেষে বাড়ি ফেরার সময় হলো। ফিরে এসে দেখি মা-বাবা আমাকে নিতে এসেছেন। সবাইকে বিদায় জানিয়ে আমি তাদের সাথে নিজের বাড়িতে ফিরে এলাম।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর পাহাড়, ঝরনা আর নদীর মিলিত রূপ সত্যিই আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

চতুর্থ শ্রেণি, বারহাট্টা সরকারি প্রাথমিক মডেল স্কুল, নেত্রকোণা



আইল্যান্ড হপিং

ডালিয়া ইয়াসমিন



ব্যাংকক থেকে প্রায় ৮৬০ কি.মি. দূরে থাইল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ফুকেট। এটি আন্দামান সাগরের তীরে অবস্থিত। ফুকেটের চারিদিকে রয়েছে আরো ৩২টি দ্বীপ। পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর শহরটি সমুদ্রবেষ্টিত। নীল সমুদ্রের ফেনিল ঢেউ বালুকাময় সৈকতে অবিরাম আছড়ে পড়ছে। সমুদ্রের স্বচ্ছ পরিষ্কার পানি আর রৌদ্রজ্জ্বল চিকচিক বালু যেন এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। পাশ্চাত্যের অসংখ্য পর্যটক এই সৈকতে সূর্যস্নান করতে আসে। ফুকেটের সমুদ্রসৈকতগুলোর মধ্যে পাতং, সুরিন, কাটা নয়, কামালা, কাটা বিচ, করন বিচ অন্যতম। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সারা বছর হাজার হাজার পর্যটক ছুটে আসে ফুকেটে। ফুকেটে দিনরাত বলে কিছু নেই, সব সময় থাকে জমজমাট। বিচ রোড ধরে রয়েছে অসংখ্য স্ট্রিট ফুডের দোকান। খাবারের আস্বাদন নিতে ভোজনপ্রেমীরাও ছুটে আসে এখানে।

ঢাকা থেকে ব্যাংকক, সেখান থেকে দুই ঘণ্টার ট্রানজিট নিয়ে ফুকেটের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। প্রথম দিন ফুকেট পৌঁছাতে দিন শেষ। শান্ত-স্নিগ্ধ বিকেলটা কাটানোর জন্য সেদিন ছুটে যাই ক্যাফে ফুকেট ভিউ পয়েন্টে। সুন্দর এই রেস্তোরাঁটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। নিচে উত্তাল সমুদ্রের ফেনিল ঢেউ বড়ো বড়ো পাথরের উপর আছড়ে পড়ছে। পাহাড়ের কোলে গোল বাঁশের ঝুড়ির মধ্যে করা হয়েছে বসার ব্যবস্থা। চারিদিকে নারকেল গাছবেষ্টিত রেস্তোরাঁতে রয়েছে বিনোদনের সব ব্যবস্থা। এখানে উঁচু পাহাড়

থেকে দোলনায় নিজেকে ছুড়ে দেওয়া যায় সমুদ্রের বুকে। সূর্যাস্তের লালচে আভায় রাঙানো বিকেল কাটানো যায় পিয়ানোর কি-বোর্ডে হাত বুলিয়ে। সাজিয়ে রাখা পিয়ানোটা মনে হবে সমুদ্রের একটি অংশ। কী দারুণ সব আইডিয়া দিয়ে সাজানো ভিউ পয়েন্টটি। সেখানে সন্ধ্যা নামল এক ঝাঁক ঝিঁঝি পোকার ডাকে।

পরদিন জাহাজে পাড়ি দিলাম আন্দামান সাগরে। গন্তব্য ফি ফি আইল্যান্ড। যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। নীল সাগর পাড়ি দিয়ে যখন কো ফি ফি ডন পৌঁছাই তখন সকাল গড়িয়ে দুপুর। হোটেলে চেকিং আর খাওয়াদাওয়া শেষে বেরিয়ে পড়ি মায়া বে বিচের উদ্দেশ্যে। যাওয়ার পথ সত্যি বিপদজনক। লং টেইল বোট বারবার আছড়ে পড়ছে আন্দামানের বুকে। ঘণ্টাখানেক উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পৌঁছে যাই মায়া বে তে। লং টেইল বোট থেকে নেমে প্রথমে একটা ছোটো বনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ছায়া ঘেরা গাছগাছালিতে পরিপূর্ণ বনের অপর প্রান্তে মায়া বে'র অবস্থান। মায়া বে দেখে মনে হলো মায়াবি এক রাজ্যে চলে এসেছি। চারিদিকে উঁচু পাহাড়বেষ্টিত এক নীলাভ পানির সৈকত। ধবধবে সাদা বালুকাময় সৈকতের নীল পানিতে নেমে পড়েছে সব পর্যটক। দূরের উত্তাল ঢেউ শুভ্র ফেনা তুলে ছুটে আসছে তীরে। সমুদ্রের পানি তীর থেকে যখন নেমে যাচ্ছে তখন পায়ের নিচ থেকে সাদা বালু সরে যাচ্ছে। এত মিহি সাদা বালু হতে পারে তা জানা ছিল না। চারিদিকে পাহাড়বেষ্টিত নীল পানি মায়া বে ছবির থেকেও সুন্দর। সময় বেধে যে মায়া বে তে থাকা যাবে না তা সেদিন বুঝে গেছি। এত সুন্দর নীল সমুদ্রতট সারাজীবন স্মৃতির মানসপটে থাকবে।

মায়া বে থেকে আবার লং টেইল বোটে। চলে এলাম ফি ফি লে তে। উঁচু পাহাড়বেষ্টিত নীল পানির আন্দামানে ফি ফি লে'র অবস্থান। স্বচ্ছ কাচের মতো পরিষ্কার পানিতে সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত দেখা যায়। যদিও গভীরতা বেশি নয়। এখানে স্নোরকেলিং করার জন্য লাইফ জ্যাকেট আর গগলস পরে পানিতে নামতে হয়। পর্যটকরা ডুব দিয়ে রঙ-বেরঙের মাছ দেখার জন্য পানির নিচে চলে যায়। তবে মজার ব্যাপার হলো, শান্ত ছায়া ঘেরা সেই বিকেলে রঙিন মাছগুলো আমাদের বোটের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এত কাছ থেকে ঝাঁক ঝাঁক রঙিন মাছ খালি চোখে দেখতে অসাধারণ লাগছিল। ডুব দিয়ে নয়, হাত বাড়িয়েই মাছগুলো ধরা যাচ্ছিল। ফি ফি আইল্যান্ড থেকে ফেরার পথে ভাইকিং কেভ গেলাম। গলিত লাভা পাহাড়ের গা বেয়ে বাদুড়ের মতো ঝুলে আছে। এর ভেতর দিয়ে চলে গেছে এক দুর্গম রহস্যময় গুহা।

ফি ফি আইল্যান্ডে ফিরে সন্ধ্যায় খাওয়ার জন্য ঢুকে গেলাম ম্যাকডোনাল্ডে। ছোট্ট এই দ্বীপেও রয়েছে বিখ্যাত সব রেস্তোরাঁ। পর্যটকবান্ধব টুরিস্ট স্পটে মানসম্মত খাবারসহ পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা খুব জরুরি। মাঝরাত পর্যন্ত ফি ফি আইল্যান্ডের বিচে ঘুরলাম। নিজেকে এতটুকু অনিরাপদ বা অরক্ষিত মনে হয়নি। পাশ্চাত্যের দেশ থেকে আসা পর্যটকদের আনন্দের সবরকম আয়োজন আছে ডন ফি ফি তে। জীবন কত রঙিন তা ফি ফি-তে আনন্দরত পর্যটকদের না দেখলে বোঝা যাবে না।

পরদিন আবার জাহাজে করে উত্তাল আন্দামানে পাড়ি দিলাম। জাহাজ থেকে একটা মজার ব্যাপার চোখে পড়ল। ঝাঁকে ঝাঁকে জেলি ফিস জাহাজের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। সমুদ্রের গাংচিলের মতো জেলি ফিসগুলোও যেন জাহাজের পিছু ছুটছে। গন্তব্য যেহেতু ছিল জেমস বন্ড আইল্যান্ড, তাই ভেতরে খুবই রোমাঞ্চকর অনুভূতি কাজ করছিল। জেমস বন্ড আইল্যান্ডে যাওয়ার পথটা সত্যি অ্যাডভেঞ্চারে পরিপূর্ণ। সমুদ্রের বুক চিরে দাঁড়িয়ে আছে আকাশছোঁয়া সব উঁচু পাহাড়। তারই পাশ কাটিয়ে জাহাজ ছুটছে গহীনে। হঠাৎ বেজে উঠল ট্যান ট্যানা! জেমস বন্ড সিনেমার মিউজিক। শুনে বুঝে গেলাম আমরা জেমস বন্ডের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। জাহাজ থামল, তবে দ্বীপে নয়। লম্বা বোটে নামলাম, বোট নিয়ে গেল জেমস বন্ড আইল্যান্ডে। এক বিশাল



গুহার পাদদেশে নামানো হলো। দেখে মনে হলো প্রস্তর যুগে চলে এসেছি। এই পাথুরে পাহাড়ের এক একটা চূড়া মাথা উঁচু করেও দেখা যায় না। একটু যেতেই চোখে পড়ল নীল জলরাশির উপর খাঁড়া দাঁড়িয়ে থাকা এক বিশাল পাহাড়। ১৯৭৪ সালে জেমস বন্ড সিরিজের নবম ছবি 'দ্য ম্যান উইথ দ্য গোল্ডেন গান'- এর দৃশ্য ধারণ হয়েছিল এই দ্বীপে। এরপর থেকেই এই দ্বীপের নাম হয় জেমস বন্ড আইল্যান্ড। ব্রিটিশ অভিনেতা রজার মুর নাকি এই পাহাড় লক্ষ্য করেই গুলি ছুড়েছিল। আমরাও আঙুল উঁচিয়ে গুলি করতে নেমে পড়লাম।

এবার জাহাজ নিয়ে এল আরো এক স্পটে। পাহাড়বেষ্টিত আন্দামান সাগরের ফোর আইল্যান্ডে সবাই কায়াকিং আর সুইমিং করতে নামে। উঁচু এই পাহাড়গুলোর নিচে আলো-আঁধারিতে ঘেরা রহস্যময় অসংখ্য গুহা রয়েছে।

কায়াকিং বোটগুলো রহস্যময় সেই গুহার তলদেশ ঘুরিয়ে আনে। আন্দামান সাগরের প্রবল স্রোতকে উপেক্ষা করে কায়াকিং বোটে বাবার সাথে নেমে পড়ল ৫ বছর বয়সি এক বাচ্চা আর ১৩ বছরের এক কিশোর। দূর থেকে দেখলাম স্রোতের বিপরীতে দুলতে দুলতে দুঃসাহসীরা রহস্য উদ্‌ঘাটনে গুহার ভেতর ঢুকে পড়ল। আধ ঘণ্টার গুহা অভিযান শেষে বিশ্ব জয়ের হাসি নিয়ে ফিরে এল তারা। সেদিন জাহাজের উঁচু ডেক থেকে সুইমিং করার জন্য স্লাইডিং নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দুঃসাহসী সেই ছেলে দুটো সকল ভয়কে উপেক্ষা করে স্লাইডিংয়ে স্লিপ খেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আন্দামান সাগরে। বিশাল আনন্দ নিয়ে আন্দামানের বুকে তাদের ঝাঁপাঝাঁপি আর উচ্ছ্বাস ছিল দেখার মতো। বলে রাখছি দুঃসাহসী সেই ছেলে দু'জনের মাতা এই ভ্রমণ কাহিনির লেখক। সেদিনের কায়াকিং আর সুইমিংয়ে অভিযাত্রী ছিল জাহাজের সব পর্যটক।

দিনভর ঘোরাঘুরি শেষে ফুকেটের উদ্দেশে যখন রওয়ানা হলাম তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। সূর্যাস্তের রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে পুরো আন্দামান সাগরে। সারাদিনের ক্লান্তি শেষে পাখিদের মতো যখন ঘরে ফিরছিলাম তখন সূর্যিমামা আলোর পাট চুকিয়ে সাগরের বুকে ডুব দিয়েছে।

ফুকেটে বিগ বুদ্ধা, চালন টেম্পল, ক্যাসনেট ফ্যাক্টরি, এলিফ্যান্ট স্যাংচুয়ারি, টাইগার পার্ক ছাড়াও দেখার আরও অনেক কিছু রয়েছে। তবে সবকিছু ছাপিয়ে নির্জন দ্বীপের রহস্যময় হাতছানি ভ্রমণপিপাসুদের সবসময় আকৃষ্ট করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ❑

পরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর



বিশ্ববিখ্যাত পরিব্রাজক

রাহাত আরা চৌধুরী

এক সময় মানুষ আশপাশের যতটুকু জানত, তাকেই পুরো পৃথিবী মনে করত। সে সময় কেবল পর্যটক ও অভিযাত্রীরা পৃথিবীকে জানার স্পৃহা থেকে বেরিয়ে পড়তেন, পাড়ি জমাতেন অজানার উদ্দেশে। বণিকরা বাণিজ্য করতেন, আর পর্যটকরা বেরিয়ে পড়তেন ভ্রমণে। এ দুই সম্প্রদায়ের লোকজনই নিয়ে আসতেন দূর-দেশান্তরের শিল্পকলা, সংস্কৃতি, ধন-সম্পত্তি, আচার-ব্যবহারের খবরাখবর।

সে যুগে পরিভ্রমণ মানেই দুর্গম পথে যাত্রা। তবু দুঃসাহসী পরিব্রাজকেরা ছুটতেন নতুন তথ্য কিংবা কম খরচের সামগ্রী পাওয়ার আশায়। এভাবেই অনেক সময় তাঁরা আবিষ্কার করতেন নতুন দেশ, মহাদেশ; মানুষের সামনে হাজির করতেন অজানা সংস্কৃতি-প্রযুক্তির। এমন অনন্যসাধারণ কয়েকজন পরিব্রাজকের কথা তোমাদের জন্য তুলে ধরলাম।

ফার্দিনান্দ ম্যাগিলানঃ (১৪৮০-১৫২১) স্পেন থেকে ইন্দোনেশিয়ার 'মরিচ দ্বীপ'-এর খোঁজে বেরিয়েছিলেন পর্তুগিজ পরিব্রাজক ফার্দিনান্দ ম্যাগিলান। ম্যাগিলানের এই বহরই প্রথম নৌপথে বিশ্ব ঘুরেছিল। সঙ্গে ছিল পাঁচটি জাহাজে ২৭০

জন সাহায্যকারী। সেই বহর তিন বছর পর যখন স্পেনে ফিরে আসে, তখন বেঁচে ছিলেন মাত্র ১৮ জন। প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরকে জোড়া লাগানো ম্যাগিলান প্রণালির আবিষ্কারকও তিনি। এমনকি প্রশান্ত মহাসাগরের নামকরণও করেছিলেন ফার্দিনান্দ ম্যাগিলান।

জেমস কুকঃ (১৭২৮-১৭৭৯) পরিব্রাজক হিসেবে সাতটি মহাদেশ, উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু এবং প্রতিটি মহাসাগর পাড়ি দেওয়াসহ বহু রেকর্ডের মালিক জেমস কুক। কর্মকর্তা জেমস কুকের পরিব্রাজক হিসেবে যাত্রা শুরু হয় ১৭৬৮ সালে। সেই যাত্রায় তিনি একে একে নিউজিল্যান্ড, অ্যান্টার্কটিকা এবং হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের খোঁজ পেয়েছিলেন।

হিউয়েন সাঙঃ (৬০২-৬৬৪) ছিলেন বিখ্যাত চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু, পণ্ডিত, পর্যটক এবং অনুবাদক। ধারণামতে ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের কোন এক সময়ে তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন এবং ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ তিনি বাংলায় প্রবেশ করেন। তিনি মূলত গৌতম বুদ্ধের নিদর্শন এবং স্মৃতিধন্য স্থানসমূহ পরিদর্শন এবং ভারতবর্ষ থেকে বুদ্ধ ও অন্যান্য বৌদ্ধ ভিক্ষুদের রচনা সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়ার জন্যই ভ্রমণ শুরু করেছিলেন।

ক্রিস্টোফার কলম্বাসঃ (১৪৫১-১৫০৬) অনেক অভিযাত্রী ভ্রমণের কাহিনি বিস্তারিত লিখে রাখতেন ডায়েরির পাতায়। ক্রিস্টোফার কলম্বাস ছিলেন তাদেরই একজন। ইতালির জেনোয়া শহরের এক সাহসী নাবিক। ১৪৯২ সালের সমুদ্রপথে ক্রিস্টোফার কলম্বাস অভিযান শুরু করেছিলেন। ভারতে পৌঁছানোর জলপথ আবিষ্কার করতে গিয়ে কলম্বাস ১৪৯২ সালে আমেরিকা মহাদেশ খুঁজে পান। কলম্বাস এর নামও দেন 'সান সালভাদর'। এরপর মোট চারবার স্পেন থেকে আমেরিকা মহাদেশে অভিযান চালান তিনি।

স্যার এডমন্ড পার্সিভাল হিলারিঃ (১৯১৯-২০০৮) পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ 'মাউন্ট এভারেস্ট' প্রথমবার জয় করা মানুষ স্যার এডমন্ড পার্সিভাল হিলারি। তিনি ছিলেন নিউজিল্যান্ডের একজন পর্বতারোহী এবং অভিযাত্রী। ১৯৫৩ সালের ২৯ মে ১১টা বেজে ৩০ মিনিটে শেরপা তেনজিং নোরগে প্রথম মানুষ হিসেবে এভারেস্টের শৃঙ্গে পা রাখেন। জয় করেন মাউন্ট এভারেস্ট। কমনওয়েলথ ট্রান্স-আটলান্টিক অভিযানের অংশ হিসেবে ১৯৫৮ সালে দক্ষিণ মেরু পৌঁছান। পরবর্তীকালে উত্তর মেরু অভিযান করলে বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে পৃথিবীর দুই মেরু ও সর্বোচ্চ শৃঙ্গে পদার্পণের দুর্লভ কৃতিত্ব অর্জন করেন।

ফা-হিয়েনঃ বিখ্যাত চীন দেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়েন দীর্ঘ পথ পায়ে হাঁটেন। মধ্য এশিয়া ভারত ও শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ করে এ সংক্রান্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে যান। একে একে গঙ্গা উপত্যকায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির পবিত্র স্থানগুলো দর্শন করেন। ভ্রমণ শেষ হলে তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে সমুদ্রপথে সিংহল, মালয় এবং যবদ্বীপ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। হিয়েনের বিবরণ অনুসরণ করে ভারত ও বাংলার বহু প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়।

মুহাম্মদ ইবনে বতুতাঃ ইবনে বতুতা ছিলেন একজন মুসলিম পর্যটক, চিন্তাবিদ, বিচারক এবং ধর্মতাত্ত্বিক। ইবনে বতুতা সারা জীবন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। পৃথিবী ভ্রমণের জন্যই তিনি মূলত বিখ্যাত হয়ে আছেন। একুশ বছর বয়স থেকে শুরু করে জীবনের পরবর্তী ৩০ বছরে তিনি প্রায় ৭৫,০০০ মাইল পথ পরিভ্রমণ করেছেন। তিনিই একমাত্র পরিব্রাজক যিনি তার সময়কার সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ভ্রমণ করেছেন এবং তৎকালীন সুলতানদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। বর্তমান পশ্চিম আফ্রিকা থেকে শুরু করে মিশর, সৌদি আরব, সিরিয়া, ইরান, ইরাক, কাজাকিস্তান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীন ভ্রমণ করেছিলেন তিনি। ৩০ বছরে প্রায় ৪০টি দেশ ভ্রমণ করে নিজ দেশ মরোক্কোতে ফেরার ভ্রমণকাহিনীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। এই ভ্রমণকাহিনীর নাম রিহলা।

মার্কো পোলো: বিখ্যাত পর্যটক মার্কো পোলো। ১২৭১ থেকে ১২৯৫ সাল পর্যন্ত ইউরোপ থেকে সিল্ক রোডে এশিয়া ভ্রমণ করেন এবং তার এই ভ্রমণকাহিনি নিয়ে পরবর্তীতে বই লেখেন। তিনি প্রথম ইউরোপীয় ছিলেন, যিনি প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের কাছে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন। সে সময় তিনি হেঁটে হেঁটে বাগদাদ শহরে পৌঁছান। মার্কো পোলোর বয়স যখন ১৭ বছর তখন থেকেই পৃথিবী ভ্রমণের যাত্রা শুরু হয়। তিনি যে এলাকা ভ্রমণ করতেন তার সবকিছু ডায়েরিতে লিখে রাখতেন। এই শুরুর মাধ্যমেই তিনি পৃথিবীর সেরা পর্যটকে পরিণত হন।

ভাস্কো দা গামা: বিখ্যাত পর্তুগিজ অনুসন্ধানী ও পর্যটক। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমুদ্রপথে তিনি ইউরোপ থেকে ভারতে আসেন। ইতিহাসে তিনি প্রথম ইউরোপিয়ান, যিনি সাগর পথ পাড়ি দিয়ে ভারতে এসে পৌঁছান। তার এ ভ্রমণ এশিয়া ও ইউরোপকে সংযোগ করার পাশাপাশি আটলান্টিক মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরের মাঝে সেতুবন্ধন রচিত করেছিল।

ইউরি আলেক্সেভিচ গ্যাগারিন: ইউরি আলেক্সেভিচ গ্যাগারিন, সেই বিখ্যাত রাশিয়ান যিনি প্রথম মানুষ হিসেবে পৃথিবীর কক্ষপথ ভ্রমণ করেছেন, অর্জন করেন 'প্রথম মহাকাশচারী'র খেতাব। তিনি ভস্টক নভোযানে করে ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল পৃথিবীর কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করেন। ২৭ বছর বয়সেই গ্যাগারিন আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন।

ভেলেন্তিনা তেরেসকোভা: মানব ইতিহাসে তিনি প্রথম নারী, যিনি মহাকাশ গমন করেছেন। একক পাইলট হিসেবে ভস্টক-৬-কে নিয়ে যান মহাকাশে। সেই নারীও একজন সোভিয়েত নাগরিক। তেরেসকোভা স্কুলে করেসপন্ডেস কোর্সের মাধ্যমে পড়াশোনা করেন, পাস করেন ইঞ্জিনিয়ারিং। ছেলেবেলা থেকেই তার প্যারাসুট ঝাঁপের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। ❑

প্রাবন্ধিক

তোমাদের জন্য ভ্রমণ নিয়ে বিখ্যাত মনিষীদের উক্তি:

ভ্রমণ মানুষকে বিনয়ী করে তোলে। সে জানতে পারে দুনিয়ার তুলনায় সে কত ক্ষুদ্র।

-গুস্তাভ ফ্লুবেয়ার

নতুন কোনো শহরে একাকী ঘুম থেকে জাগা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আনন্দের অনুভূতি।

-ফ্রেয়া স্টাক

পৃথিবী একটা বই আর যারা ভ্রমণ করে না তারা বইটি পড়তে পারে না।

-সেন্ট অগাস্টিন

ভ্রমণ নিজেকে জানার অন্যতম উপায়।

-লরেন্স ডুরেল

ভ্রমণ শেষে নিজ বাড়িতে ফেরার আগ পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারে না ভ্রমণ কত সুন্দর ছিল।

-লিন ইউতাং

একজন ভালো ভ্রমণকারীর কোনো নিদিষ্ট পরিকল্পনা এবং গন্তব্যে পৌছানোর উদ্দেশ্যও থাকে না।

-লাও জু

ভ্রমণের মাধ্যমেই মানুষ জানতে পারে ভিনদেশ সম্পর্কে তার অনেক ভুল ধারণা ছিল।

-অ্যালডাউস হাক্সলি

ভ্রমণ পরমতসহিষ্ণুতা শেখায়।

-বেঞ্জামিন দিজরেলি

নতুন অচেনা কোনো দেশে গেলে মানুষ শিশু বয়সের বিস্মিত হওয়ার মতা অনুভূতিটি ফিরে পায়।

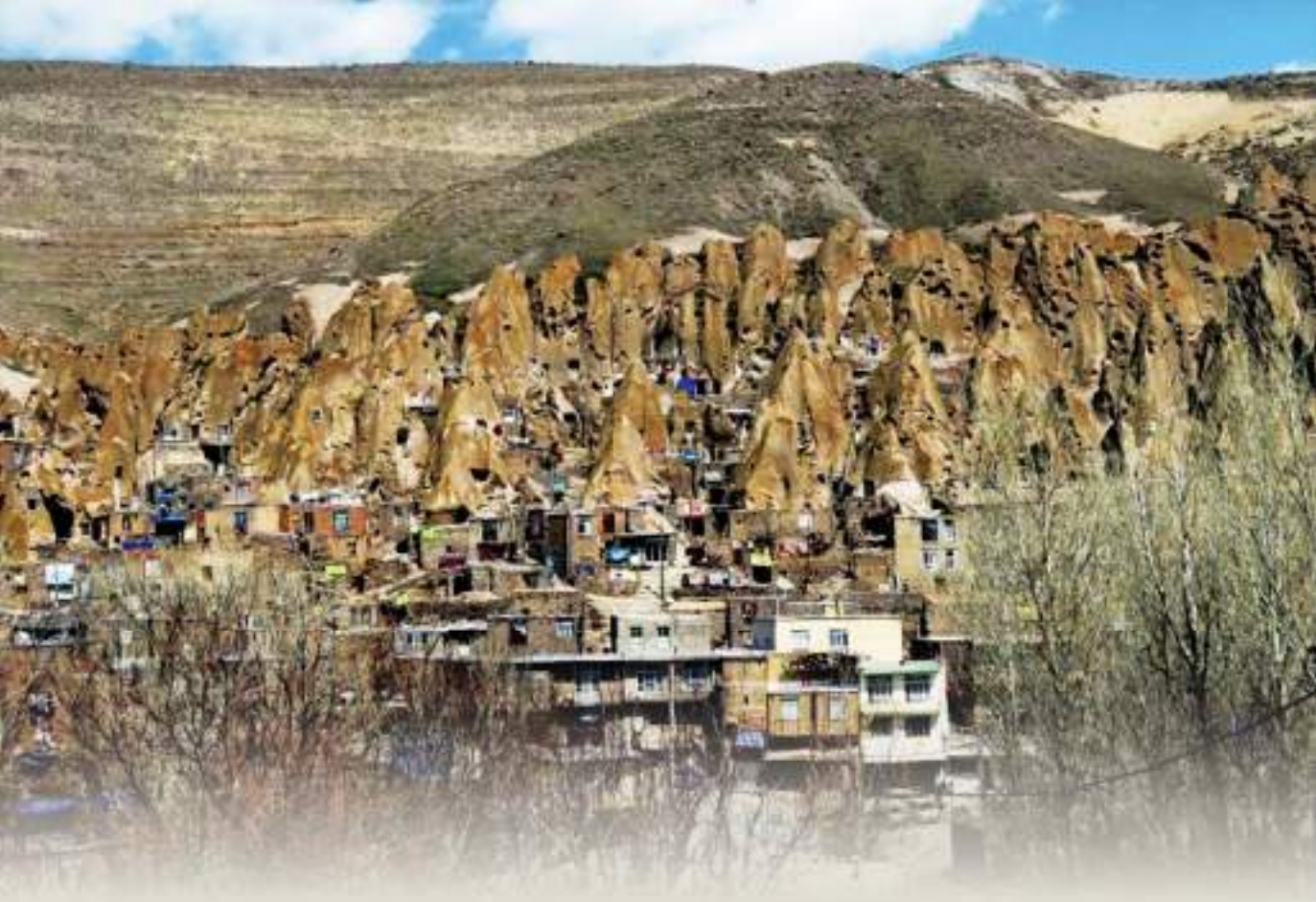
-বিল ব্রাইসন

ভ্রমণের মাধ্যমেই আমি প্রথম বাইরের দুনিয়া সম্পকে অবহিত হয়েছি এবং নিজেকে দুনিয়ার অংশ হিসেবে ভাবার পথ খুঁজে পেয়েছি।

-ইউডোরা ওয়েল্টি

ভ্রমণ মানুষকে জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করে।

-জেফারসনস



পাহাড়ের বুকে মৌচাক

ফারজানা হক

ইরানের পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের একটি গ্রাম আছে। গ্রামটি দেখলে মনে হবে যে তোমরা যেন অন্য কোনো গ্রহে চলে এসেছো। এই গ্রাম পুরোটাই পাহাড় খোদাই করে বানানো হয়েছে, অবিশ্বাস্য মনে হলেও কিন্তু সত্যি। ইরানের বুকের এই অদ্ভুত গ্রামটির নাম কান্দোভান (Kandovan)। প্রকৃতি ও মানুষের হাতের ছোঁয়ায় সৃষ্ট এক আশ্চর্য জনপদ। প্রায় ৭০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এ গ্রামে মানুষ এভাবেই জীবনযাপন করে আসছে! মৌমাছির চাকের মতো দেখতে বলে ফার্সি ভাষায় এর নাম হয়েছে কান্দোভান যার অর্থ মৌমাছির চাকের দেশ।

এর পেছনের ইতিহাস এবং ভূতত্ত্ব দুটোই কিন্তু সমান আকর্ষণীয়। বহু বছর আগে এই অঞ্চলে সাহান্দ নামে একটি আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নুৎপাত হয়েছিল। সেই লাভা আর ছাই জমে ধীরে ধীরে নরম এক ধরনের পাথরের স্তর তৈরি হয়। হাজার হাজার বছর ধরে বাতাস আর বৃষ্টির কারণে সেই নরম পাথরের ক্ষয় হয়ে আজকের এই অদ্ভুত কোণ আকৃতির রূপ নিয়েছে। ইতিহাস বলে, প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ বছর আগে মঙ্গোলবাহিনী যখন ইরান আক্রমণ করেছিল তখন প্রাণ বাঁচাতে স্থানীয় মানুষজন এই দুর্গম পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা বুঝতে পারে এই নরম পাথর খোদাই করে বসবাসের জন্য ঘর বানানো খুব সহজ। সেই থেকে শুরু হয় কান্দোভানের

গুহা গ্রামের পথচলা। এখানকার ঘরগুলোকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'কারান' (Karaan)। তবে এগুলো গুহা থেকে অনেক আলাদা। প্রতিটি বাড়ি দুই থেকে তিন তলা পর্যন্ত উঁচু। নিচতলাকে ব্যবহার করা হয় গবাদি পশু রাখার গোয়াল হিসেবে। উপরের তলাগুলোতে থাকে রান্নাঘর, শোয়ার ঘর এবং বসার জায়গা। এখানকার সবচেয়ে বড়ো ম্যাজিক হলো এর তাপমাত্রা। মাটির বা পাথরের ঘরেও যে কতটা রাজকীয় শান্তি পাওয়া যায় কান্দোভান তার উজ্জ্বল উদাহরণ। পাথরের পুরো দেওয়াল গরমকালে ঘরকে ঠান্ডা রাখে আর শীতকালে রাখে উষ্ণ। তাই আলাদা করে হিটার বা এসির প্রয়োজন হয় না। শীতকালে যখন চারপাশ বরফে ঢেকে যায় তখন এই পাথরের ঘরগুলো হয়ে ওঠে নিরাপদ আশ্রয়। আর গ্রীষ্মে যখন তাপমাত্রা বেড়ে যায় তখন ভেতরে থাকে প্রাকৃতিক শীতলতা। আধুনিক যুগে এত কার্যকর তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আর নেই যতটা আছে এই প্রাচীন গুহা বাড়িগুলোতে।

সময়ের সাথে সাথে এই বাড়িগুলোতে আধুনিকতার ছোঁয়াও লেগেছে। এখন প্রায় প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ, পানি এবং অন্যান্য আধুনিক সুবিধাগুলো পৌঁছে গেছে। গ্রামটিতে বর্তমানে প্রায় ১৬০টিরও বেশি পরিবার বসবাস করে। কান্দোভানের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রা মূলত কৃষি, পশুপালন এবং পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল। এখানকার উর্বর জমিতে যেমন চাষাবাদ হয় তেমনি পাহাড়ি ঢালে চড়ে বেড়ায় ভেড়া ও ছাগলের পাল। পাহাড়ের ঢালু আর উঁচুনীচু পথ হওয়ার কারণে এখানে গাড়ি চলাচল করা কঠিন। তাই আজও এখানকার মানুষ মালামাল বহনের জন্য গাধা ব্যবহার করে। তবে বর্তমানে এ গ্রামের আয়ের একটি বড়ো অংশ আসে পর্যটন থেকে। কান্দোভান একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। এই গ্রামটি বর্তমানে সারা বিশ্বের পর্যটকদের কাছে একটি বড়ো আকর্ষণ। প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক এ জীবন্ত ঐতিহাসিক বিস্ময় দেখতে ভিড় জমান। পর্যটকদের জন্য এখানে পাথরের মধ্যেই খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং স্যুভনিয়রের দোকান। পর্যটকরা এখানকার বিখ্যাত মধু, শুকনো ফল এবং হাতে তৈরি জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যান। পর্যটকরা এখানে এসে সরাসরি পাথরের গুহায় রাত কাটানোর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা নিতে পারেন। এখানকার বিশুদ্ধ খনিজ পানির ঝরনাও বিখ্যাত। স্থানীয়দের বিশ্বাস, এই পাহাড় থেকে নেমে আসা পানির ঔষধি গুণ রয়েছে। যা বিভিন্ন রোগের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়।

তুরস্কের শিলা-খোদাই করা গ্রাম কাপ্পাদোসিয়ার সাথে কান্দোভানের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও কান্দোভানের বিশেষত্ব হলো এটি এখনো একটি প্রাণবন্ত ও জীবন্ত গ্রাম। যেখানে কাপ্পাদোসিয়ার বেশিরভাগ গুহা ঘর এখন হোটেল বা জাদুঘরে পরিণত হয়েছে, সেখানে কান্দোভানে মানুষ আজও তাদের পূর্ব-পুরুষদের তৈরি করা পাথরের ঘরে বংশ-পরম্পরায় বাস করছেন। যুগের পর যুগ পার হয়ে গেলেও কান্দোভানের মানুষ এই পাথুরে ঘরগুলোকে ছেড়ে আধুনিক শহরে চলে যায়নি। তারা আজও প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে এই রূপকথার গ্রামটিকে টিকিয়ে রেখেছে।

এটি শুধু একটি পর্যটন কেন্দ্র নয় বরং মানবসভ্যতার খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতার এক দারুণ উদাহরণ। রাতে এ গ্রামটি এক অন্য রূপ নেয়। পাহাড়ের গায়ে জড়িয়ে থাকা ছোটো ছোটো জানালায় আলো জ্বলে ওঠে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন তারা ভরা আকাশ মাটিতে নেমে এসেছে। নিস্তব্ধ পাহাড়, ঠান্ডা বাতাস আর আলো ঝলমলে পাথরের ঘর– পুরো দৃশ্যটা অবাস্তব সুন্দর লাগে। পাহাড়ের ওপর থেকে যখন পুরো গ্রামটি দেখা যায় তখন মনে হয় এ যেন এক জাদুকরী মৌচাক। কান্দোভান প্রমাণ করে দেয়, প্রকৃতি এবং মানুষের সৃজনশীলতা মিলিয়ে কত কিছু করা যেতে পারে। যা শত শত বছর পরও তার আবেদন হারায় না। আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও এই গ্রামটি তার আদি ও অকৃত্রিম সৌন্দর্য আজও ধরে রেখেছে, যা পৃথিবীর বুকে এক জীবন্ত ইতিহাস। কি নবারুণ বন্ধুরা, যাবে না-কি মৌচাক গ্রামে?



তামাজুর জামান গল্প
দ্বিতীয় শ্রেণি
ইঞ্জিনিয়ারিং
ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড
কলেজ, পলাশী, ঢাকা



আরিবা তাবাসসুম, নবম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-50, No-7. January 2026, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022



আনিসা চৌধুরী, ষষ্ঠ শ্রেণি, ম্যাপল লীফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ধানমন্ডি

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা